অন্যরকম ভ্রমণ

বেড়ানোর পথ, প্রেরণা বা পরামর্শ একইসঙ্গে নির্ভুল আর সহজলভ্য হওয়া সহজ নয়। তাছাড়া ভ্রমণপরামর্শের পরিধিও সারা বিশ্বজুড়েই ক্রমবর্ধমান। দেশে-দেশে ভ্রমণসাংবাদিকতার সংজ্ঞা বা সীমাও এক নয়। উত্তরবঙ্গের অরণ্যভ্রমণ আর মিশরের মরুভ্রমণ— শুধু দুটি আলাদা মাত্রার ভ্রমণ নয়, এই দুই জায়গার ভ্রমণপরামর্শের ধ্যান-ধারণাও আলাদা হতে বাধ্য।

ভারতের মধ্যেও স্থান-কাল নির্বিশেষে শুধু দ্রষ্টব্যের তালিকা প্রকৃত ভ্রমণপিপাসুর মন ভরাতে যথেষ্ট নয়। বেড়াতে বেরিয়ে বিশেষ বিশেষ স্থানের বিশেষ বিশেষ নিরীক্ষা ও ভাবোন্মোচনও মানুষকে আলো দেখায়।

মন-ভোলানো, প্রাণ-ভরানো সার্থক ভ্রমণের সংজ্ঞা কী? এককথায়, যে ভ্রমণের যত সুখস্মৃতি, সেই ভ্রমণ তত সার্থক। যত মন-জাগানিয়া, তত মহান।

মাসখানেক আগে গিয়েছিলাম হরিদ্বার, হৃষীকেশ, ধনৌলটি, মুসৌরি। হরিদ্বারের হর-কি-পৌড়ি থেকে হিমালয়ের দিকে যেতে ২৩-২৪ কিলোমিটার এগিয়ে হৃষীকেশের মুনি-কি-রেতিতে কয়েকবারই চা-টা খেয়েছি বা দুয়েকবেলা কাটিয়ে গেছি। রাস্তার বাঁদিকে মুনি-কি-রেতির পথ বেঁকে গেছে, আর মুনি-কি-রেতির মোড় থেকে দু-চার কদম পিছিয়ে ডানদিকে অপ্রশস্ত রাস্তা ধরে দু-চার মিনিট এগোলেই হৃষীকেশের নির্জন নতুন ঠিকানা— সিসমঝারি। এখানেই একেবারে গঙ্গার তীরে উত্তরাঞ্চল পর্যটন দপ্তরের পর্যটকাবাস— গঙ্গা রিসর্ট। ওপারে বিরাট সবুজ এলাকা জুড়ে মহর্ষি মহেশ যোগীর পরিত্যক্ত আশ্রম দেখে মনে পড়ে গেল ২০-২১ বছর আগে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভের স্নান সেরে মধ্য রাতের পাহাড়ি জঙ্গুলে রাস্তা পার হয়ে মহর্ষির ওই আশ্রমে এসে উঠেছিলাম। অত বড় আরণ্যক আশ্রমে প্রাণী বলতে আমরা মাত্র চারজন, আর কিছু রাতের কীটপতঙ্গ, ক্বচিৎ কখনও শেয়াল বা বনবিড়াল আর হঠাৎ হঠাৎ ময়ূরের পিলে চমকানো চিৎকার। পরদিন সকালে উত্তর কাশী যাবার পথে সেদিনের সেই রাত্রিযাপন এতদিন পরেও ভুলিনি।

হৃষীকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ ৭১ কিলোমিটার। এপথে মাঝে মাঝেই রাস্তা থেকে গঙ্গাতীরের বালুকাবেলায় নেমে যান। এক-আধ ঘণ্টা কাটান। ব্যাসীর ঠিক ৬ কিলোমিটার আগে এরকম একটি দারুণ নির্জন গঙ্গাসৈকত। রাস্তা থেকে এবড়োখেবড়ো পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে বসে থাকুন। শুয়েও পড়তে পারেন। নির্জন, নির্বিঘ্ন, নিরাপদ। সর্বক্ষণ গঙ্গার কুলুকুলু। এ পথে শুধু দেবপ্রয়াগই নয়, ক্রমশ রুদ্রপ্রয়াগও ঘুরে আসতে পারেন। কেদারনাথ দর্শনার্থীরা রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই গৌরীকুণ্ড হয়ে চলে যান কেদার দর্শনে। সে অন্য সফর। তীর্থযাত্রা।

হৃষীকেশ থেকে চাম্বা হয়ে চলে যান ধনৌলটি। ২ রাত ধনৌলটিতে থাকুন। সকাল দুপুর বিকেল পায়ে হেঁটে ঘুরুন। অদূরে চোখের সামনে হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি। ধনৌলটি থেকে মুসৌরি হয়ে দেরাদুন। আর এই সাতদিনের ভ্রমণে বড় বড় লাল হলুদ পেঁপে যেখানেই পাবেন, কিনে নিন। এমন মিষ্টি পেঁপে, যে বহুদিন মনে থাকবে। এই ভ্রমণে হরিদ্বারে অলকানন্দা হোটেলে ২ রাত আর হৃষীকেশের সিসমঝারি গঙ্গা রিসর্টে ১ রাত অবশ্যই থাকবেন।

এখন মস্কো যাচ্ছি সম্পাদকদের বিশ্বসম্মেলনে। জুনের ৪ থেকে ৭। তারপর টেলিভিশনের ছবি তুলতে ট্রেনে সেন্ট পিটার্সবুর্গ। সেখান থেকে ট্রেনে হেলসিংকি। হেলসিংকি থেকে আবার ট্রেনে রোভানিয়েমি। সেখান থেকে বাসে সুমেরু বৃত্তের এনারি হ্রদ। তারপর ক্রমশ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের জনপদ হ্যামারফেস্ট।

'ভ্রমণ', জুলাই ২০০৬

এতসব আশ্চর্যের মধ্যে আমি গেলাম কী করে!

বেইজিং থেকে বিমানে চলেছি উলানবাতর। নতুন দেশ দেখার উত্তেজনা কখনও পুরনো হয় না। কিশোর বয়সে কতদিন চাপা উচ্ছ্বাসে বিভোর হয়ে চলে গেছি দূর দূর দেশে। যেখানে যত দেশের কথা পড়েছি, শুনেছি, সেসব দেশে আপনমনে ঢুকে পড়েছি। কখনও পৌঁছে গেছি রূপকথার তেপান্তরের মাঠে। সেখানে স্পষ্ট দেখেছি বুড়ো তালগাছের মাথায় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাসা। দুজনে সারাদিন শুধু নীচের পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে কথা বলে।

দূর-দুর্গম এইসব রাজ্যে যাবার পথ ছিল একটাই। বারুইপুর থেকে বেঁকে লক্ষ্মীকান্তপুর আর ডায়মন্ডহারবার অবধি চলে যাওয়া দুটি রেললাইন। ট্রেনেরও দরকার হত না। শুধু রেললাইন ধরে চলে যেতাম।

রেল ছাড়া কি ভ্রমণ হয়? ভ্রমণকাহিনী হয়?

সপ্তাহ-তিনেক আগে বার্লিন থেকে ইন্টারলাকেন যাবার পথে ট্রেনে বসেই 'বল্গা হরিণের খোঁজে' প্রায় অর্ধেক লেখা হয়ে গেল।

ইন্টারলাকেন থেকে ইয়ুমফ্রাও বা মন্ট্রো থেকে জারমট, জারমট থেকে গনরেগ্রাট— সব যেন হুবহু স্বপ্নের রেলপথ, রূপকথার রেলগাড়ি।

এতসব আশ্চর্যের মধ্যে আমি গেলাম কী করে? নর্থকেপ, হ্যামারফেস্ট থেকে ফিরে এসে দেখি ইউরেল-পাসের পাঁচদিন এখনও ট্রেনে চড়াই হয়নি। তার ওপর ইউরোপ যাওয়া-আসার একটা ফ্রি টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে রেল-পাসের মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে ১৩ আগস্ট।

অতএব দেশে ফিরেই আবার ছুট ছুট ছুট। বাক্সপেটরা খোলবারও আর দরকার নেই। ইয়ুমফ্রাও, জারমট, গনরেগ্রাট, ম্যাটারহর্নের ছবি তোলার এমন সুযোগ কি কেউ ছাড়ে?

কিন্তু পৃথিবীর সর্বোত্তর শহর হ্যামারফেস্টের ভ্রমণকাহিনীর কী হবে? আর যে-ই ছাড়ুক 'ভ্রমণ'-এর মহাশ্বেতা কি ছাড়বে? সম্পাদককে কথা দিলাম, বিদেশে ট্রেনে বসেই লিখব আর ফিরে এসেই লেখাটা দিয়ে দেব।

একদিক সামলানো গেল তো আরেক বিপত্তি। সুমেরুযাত্রার ভ্রমণচিত্রের কী হবে? আর যে-ই ছাড়ুক, 'ভ্রমণ'-ভিডিও-র রুম্পা কি ছাড়বে? তত্ত্বাবধায়ককে বোঝালাম হেলসিংকি থেকে নর্থ কেপ পর্যন্ত আমার শুট করা পঁচিশটা ক্যাসেটের শট বাছাইয়ের কাজ চালিয়ে যান, মাত্র তো ক'টা দিন, ফিরে এসেই হাত লাগাব।

এইভাবে ফ্রি হাওয়াই টিকিট আর পড়ে-থাকা রেল-পাস নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এইভাবেই ছেলেমানুষী ছবি তোলা হল মিউনিখে বাভারিয়ান লোকনৃত্যের, প্যারিসে ল্যুভর মিউজিয়ামের, সুইজারল্যান্ডে ইয়ুমফ্রাওযাত্রা আর জেরমটের রূপকথার, একবার এই ট্রেনে একবার ওই ট্রেনে বসে লেখা হল বল্গা হরিণের উপকথা।

আর একঘণ্টা পরেই বিমান উলানবাতরের মাটি ছোঁবে। এখন চিনা সময় সকাল সাড়ে আটটা। উলানবাতরে পৌঁছবে মঙ্গোলিয়ার সকাল সাড়ে দশটায়। দুদেশে এক ঘণ্টার তফাত।

মঙ্গোলিয়ায় যাচ্ছি ২৬তম বিশ্ব কবি সম্মেলনে যোগ দিতে। প্রায় দশ মাস আগে এঁদের নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে জানিয়েছিলাম শুধু কবিতা পড়তে অতদূর যাওয়া তো আর সম্ভব নয়, তবে যদি মঙ্গোলিয়ার ওপর একটা ভিডিও ফিল্ম তৈরির কাজে ওঁরা সাহায্য করেন তাহলে নিশ্চয়ই যাব।

ফিরতি ই-মেলেই তাঁদের সানন্দ সম্মতি পাওয়া গেল।

এদিকে কলকাতা থেকে ব্যাংকক হয়ে গতকাল বিকেলে বেইজিংয়ে নেমে জানতে পারি আমার রেজিস্টার্ড হাতব্যাগটি নিরুদ্দেশ। সেই ব্যাগেই ছিল আমার কবিতা, কবি সম্মেলনে যেসব কবিতা আমার ইংরিজি পাঠের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ান অনুবাদে পড়ে শোনানো হবে।

বেইজিং থেকে আজ ভোরে বিমানে ওঠার সময়ও সেই ব্যাগের সন্ধান মেলেনি। শেষপর্যন্ত যদি না-ই পাওয়া যায়, কবিতা পড়া হবে না, কিন্তু দেশ তো দেখা হবে।

'ভ্রমণ', আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০৬

প্রকৃতিকে ভালোবাসুন, মানুষকে বাঁচান

গত বছর, অর্থাৎ ২০০৫ সালে জুলাইয়ের শেষ দিকে আলাস্কা পৌঁছে ভারি বেকুব বনেছিলাম। সুটকেশ ভরা শীতের জামাকাপড়, এদিকে শীতের লেশমাত্র নেই। শেষ পর্যন্ত ডেনালি জাতীয় উদ্যানে তুন্দ্রা ভ্রমণের আগের সন্ধ্যায় শহর থেকে সুতির টি শার্ট কিনে তাতেই গ্রীষ্মনিবারণ করতে হল। এর সপ্তাহখানেক পরে আগস্ট মাসের গোড়ায় উত্তর আলাস্কার ফেয়ারব্যাঙ্কস-এ পৌঁছেও শীতের দেখা নেই। অথচ সামনেই উত্তর মেরু বৃত্তের শুরু। এই জুনে উত্তর মেরু বৃত্তের ৭০ ডিগ্রি উত্তরেও যেমন ঠান্ডা হবার কথা তেমন ঠান্ডা পাইনি। ২০০৪ সালের নভেম্বরে আন্টার্কটিকায় গিয়ে শুনেছিলাম এখানকার হিমবাহও নাকি গরমে গলতে শুরু করেছে।

তারও পাঁচ-ছ বছর আগে আমাজনে গিয়ে শুনি মানুষের রক্ষাকবচ এই জঙ্গলের বেশ খানিকটা নাকি কেটে নিয়ে তার বাণিজ্যিক ব্যবহার হবে। আমাজন ভ্রমণে আমাদের দলে বিশ্বের বহু বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক, পরিচালকরা ছিলেন। কাউকেই আমাজন নিয়ে খুব একটা ভাবতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সেবার দেশে ফিরে বিখ্যাত 'লোনলি প্ল্যানেট' ভ্রমণ গাইডের লেখিকা, আমার বন্ধু ফিলিপা স্যাক্সটনের ই-মেল পেলাম— 'তুমি ব্রাজিল থেকে সদ্য ফিরেছ, ব্রাজিল-আমাজনের অরণ্য ধ্বংসের খবরে তুমি নিশ্চয়ই ব্যথা পাবে আর তার বিরুদ্ধে কিছু করতেও তোমার আন্তরিক ইচ্ছে হবে। ব্রাজিল কংগ্রেস ব্রাজিল-আমাজনের রেইন ফরেস্টের অর্ধেকটাই কেটে ফেলার একটা প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। চিরহরিৎ এই অরণ্য বহুজাতিক সংস্থাগুলো ঘর-দরজা, আসবাবপত্র তৈরির কাঠ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করবে। অর্ধেক অরণ্য মানে পর্তুগালের চার গুণেরও বেশি এলাকা। বন কেটে নাকি ওখানে চাষ-আবাদ হবে। আসল সত্য এই যে আমাজন অরণ্যে অরণ্যই হচ্ছে ভূমির প্রাণ, সেই অরণ্যই যদি না থাকে তাহলে ওই ভূমিও নিষ্ফলা হয়ে যাবে। এর আগেও আমাজনের ১,৬০,০০০ বর্গকিলোমিটার জঙ্গল কেটে এই চেষ্টা হয়েছে, কোনও ফল হয়নি। এভাবে ব্রাজিলীয় রেইন ফরেস্টের অর্ধেক সাফ করে দিলে ওখানে বিশাল মরুভূমি জেগে উঠবে।'

আমরা যারা এই পৃথিবীকে ভালোবাসি, ভালোবাসি বিশ্বময় মানুষ-মানুষে ভালোবাসার স্বপ্ন দেখতে, আসুন, সবাই আমরা শামিল হই এক বিশ্ব জোড়া সংগ্রামে। সবুজ রক্ষার সংগ্রাম। গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার সংগ্রাম। মানুষকে ডেকে বলি, প্রকৃতিকে ভালোবাসুন, মানুষকে সুখী করুন। সারা দেশে ছড়িয়ে দিই এইসব স্বপ্ন, সংকল্প, সংগ্রাম। দেশ থেকে দেশান্তরে— যেখানেই যাই, যত দূরেই যাই, যেন সঙ্গে নিয়ে যাই এই ক'টি কথা—

প্রকৃতিকে ভালোবাসুন, মানুষকে বাঁচান।
LOVE NATURE. SAVE MANKIND.
AIMONS LA NATURE. SAUVONS L'HUMANITÉ.

'ভ্রমণ', অক্টোবর ২০০৬

পৃথিবী সুন্দর হয় মানুষের গুণে

পৃথিবীর চেয়ে বড় গ্রন্থ যেমন আর নেই, বেড়ানোর চেয়ে বেশি আনন্দের পাঠক্রমও তেমনই আর হয় না। ভ্রমণ যেন আজীবনের আনন্দপাঠ।

ভ্রমণে মন যেমন ভরে যায়, ভ্রমণহীন দিনগুলোও তেমনই ভরে ওঠে ভ্রমণস্মৃতিতে। পথের স্মৃতি, প্রান্তরের স্মৃতি। একেবারে অভিনব সব অভিজ্ঞতার স্মৃতি। এভাবেই হঠাৎ মনে ভেসে ওঠে কাজিরাঙা, ওরাং, পবিতুরা। জম্মুতে তাওয়াই নদীর তীর। লেহতে বিকেলবেলার বাজার। বুখারার চায়খানা। নাগাল্যান্ডের গ্রামে বিয়ের আসর। মারকারায় নবদম্পতির সহাস্য আমন্ত্রণ। এরকম অসংখ্য ছবি, কথা, সুর।

এসব হল ভ্রমণস্মৃতির শিমুলতুলো। আরেকটা থাকে মনের গভীরে— সে হল স্মৃতির অন্তঃশীল স্রোতোধারা। সেখানে পরতে পরতে এই পরমাশ্চর্য পৃথিবী। তার প্রকৃতি, প্রাণিলোক আর মানুষের ঘরবাড়ি নিয়ে এক অপরূপ শিল্প। বড় সুন্দর। মানুষের হাতেই এর পরমায়ু। পৃথিবী সুন্দর হয় মানুষের গুণে।

গত মাসে, নভেম্বরের শেষে কম্বোডিয়া বা কাম্পুচিয়া ঘুরে দেশে ফেরার পথে থাইল্যান্ডে দেখলাম সেখানকার বৌদ্ধ লামারা বনের বাঘকেও পোষ মানিয়েছেন। ব্যাংকক থেকে 'ব্রিজ অন দ্য রিভার কোয়াই'-খ্যাত কোয়াই নদীর ব্রিজ ছুঁয়ে বাঘের আস্তানা প্রায় ১৮০ কিলোমিটার। আস্তানার নামটিও ভারি সুন্দর— ব্যাঘ্রমন্দির। একেবারে সামনে বসে বাঘের গায়ে হাত বোলাবার সুযোগ তো কখনও পাইনি, এখানে এসে সেই দুঃসাহসিক ভালোবাসাটুকু প্রকাশ করতে পেরে খুব আনন্দ পেয়েছি। বাঘেদের খুব কাছে যাওয়ার কয়েকটা নিয়ম-কানুনের এখানে খুব কড়াকড়ি। যেমন, লাল, হলুদ, কমলা রঙের

পোশাক নিষিদ্ধ। রোদচশমা নিষিদ্ধ। তাছাড়া নিঃশব্দ নির্বাক হওয়া দরকার। সামান্য অন্যথায় সামনেই শুয়ে থাকা শান্ত বাঘটিও হঠাৎ বিরক্ত হয়ে মাথা বাগিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠতে পারে। যদিও শেকল দিয়ে বাঁধা, তবে বাঘের আবার শেকল! এর মধ্যে অন্য একটা কথা বা ব্যথাও রয়ে গেছে, তা হল, বনের বাঘকে এভাবে শেকলে বেঁধে প্রায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা কি মানুষকে মানায়!

'ভ্রমণ', জানুয়ারি ২০০৭

সেই আমার দেশ

ভারত আমার শৈশবের মাতৃক্রোড়। বাল্যের বর্ণপরিচয়। সারাজীবনের সখা ও শিক্ষক।

সবুজ ধানখেত চিরে চলে যাওয়া অসীম খাল— সেই আমার দেশ। দুপাশে সবুজে-লুকনো ছোট ছোট গ্রাম ছুঁয়ে ছুটে যাওয়া আদিগন্ত রেললাইন— সেই আমার দেশ।

দিনের শেষে পাখিদের ঘরে ফেরা, পথের শেষে বিস্ময়কর নিসর্গ দৃশ্য, পথের পাশে সনাতন ঘরবাড়ি, উঠোনে সেই চিরকালীন শিশুমেলা— সেই আমার দেশ।

নীলনদের ডোঙা থেকে জাহাজের সাততলার যাত্রীদের উদ্দেশে মিশরি ফেরিওয়ালাদের রঙিন পোশাক ছুড়ে দেওয়ার ছন্দে আকুলতায় যে জীবন ও জীবিকা— সেও আমার দেশ।

আমাজনের নদী বেয়ে জঙ্গলের ওষধিগুল্মের ঝাঁঝালো ঘ্রাণ পার হয়ে ছোট্ট দ্বীপে নেমে হঠাৎ দেখা এক বালিকার কাঠের উনুন ধরানো— সেও আমার দেশ।

জর্জিয়া-তুরস্কের সীমান্ত গ্রাম আলসিখে-তে আসন্ন সন্ধ্যায় ভারতীয় অতিথিকে গৃহস্থের 'যেতে নাহি দিব' পণ কিংবা গ্রামের হাটে আমাকে শক্ত পনির আর ঘন ক্ষীর মাখানো রুটি খাওয়াবার জন্য স্টলে স্টলে হুড়োহুড়ির মধ্যে কী দেখি? দেখি সচিত্র, সক্রিয় এক মানুষের দেশ।

বিশাল বিচিত্র দুর্গম হিমালয়ের লৌকিক অলৌকিক রূপে মুগ্ধ এই আমি যখন আন্টার্কটিকার সিয়ের্ভাকোভে বিস্ময়কর সব তুষার ভাস্কর্যের অকল্পনীয় বিভায় অন্ধ হয়ে যাই তখন আসলে তো দেখি একই দেশের দুই রূপ।

আফ্রিকা, আর্মেনিয়া, মোঙ্গোলিয়া, শ্যাম-কম্বোজ-রাশিয়া— প্রভৃতি নানা দেশের লোকনৃত্যের ছন্দে তালে অঙ্গসঞ্চালনে জীবিকার দ্বন্দ্বও যখন জীবনের ছন্দে রূপান্তরিত সে-ও তো আমারই দেশ।

একই দেশের বহুমুখ।

এই মুখ দেখা আর জীবনছন্দ ছুঁতে পারাই বোধহয় ভ্রমণের মর্মকথা।

'ভ্রমণ', মার্চ ২০০৭

দেখা মানেই আলো, না-দেখার অর্থ অন্ধকার

কোথাও বেড়াতে গিয়ে আমরা কী দেখি? পাহাড় থাকলে পাহাড় দেখি, সাগর থাকলে সাগর দেখি, ঝরনা থাকলে ঝরনা দেখি, হ্রদ থাকলে হ্রদ দেখি, সবুজের সমারোহ দেখি, ইতিহাসের দুর্গ-প্রাসাদ দেখি। বড় কোনও মন্দির মসজিদ গির্জা গুম্ফা থাকলে তা দেখব না তাই কি হয়? বিখ্যাত কোনও বাগান বা পুরনোকালের বাজার থাকলে তাও দেখি।

যেখানে যা কিছু বিখ্যাত, জানা-মাত্র মনে আশা নিয়ে ছুটে যাই— চোখে তৃষ্ণা নিয়ে দেখা চাই। যখন দেখি, মূক মন মুখর হয়ে ওঠে। সেই আত্মমগ্নতা ভ্রমণেরই দান।

দেখার তো সত্যিই শেষ নেই। জীবনের একটা বড় অর্থও হয়তো অবিরাম দেখা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেখা মানেই আলো, যেমন না-দেখার অর্থ অন্ধকার।

বেড়াতে গিয়ে আমরা অনেক কিছুই দেখি, কিন্তু সব সময় মন দিয়ে দেখা হয় না সেখানকার মানুষের মন ও জীবন। কত আতিথেয়তা, কত সহৃদয়তা, মনের সত্য ও সৌন্দর্যের কত শক্তি বালিচাপা নদীর মতো মানুষের জীবনে বয়ে চলেছে তা কি সবসময় আমরা জানতে পারি? হানাদার মেঘ যেমন তুষারাবৃত সুদীর্ঘ হিমালয়শৃঙ্গরাজিকেও সম্পূর্ণ ঢেকে দেয়, দুয়েকজন প্রতারক বা পাষাণ-হৃদয় মানুষের ব্যবহার তেমনই বড় হয়ে উঠে সব মানুষের সহজ সরল সহৃদয় রূপ আড়াল করে দেয়।

কাশ্মীর উপত্যকায় এতদিন ধরে এত যে বোমা-বারুদ, এত যে ধ্বংসের ধুন্ধুমার, সেই কাশ্মীরের ঘোড়েওয়ালা, ডান্ডিওয়ালা, শিকারাওয়ালা, হাউসবোটওয়ালা, ফুলওয়ালা, শালওয়ালা, জাফরানওয়ালা, সাধারণ মানুষজন— সবাই কিন্তু আপনার পথ চেয়ে আছে। আপ্যায়ন আর আতিথেয়তার ডালি সাজিয়ে তারা বসে আছে। এই আতিথেয়তায় আর্থিক স্বার্থও আছে ঠিকই, কিন্তু সেটাই সব নয়, সহৃদয়তাও আছে। ভারতের নানা রাজ্যে, পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে, আমি দেখেছি মানুষ সাধারণত সর্বত্রই সহৃদয়।

সেই মানুষ না দেখলে ভ্রমণ কি সম্পূর্ণ হয়? যখন যেখানেই যান, সেখানকার চিরাচরিত সাংস্কৃতিক রূপ দেখতেও ভুলবেন না। তার মধ্যেও সেখানকার মানুষেরই মুখ ফুটে ওঠে।

তাছাড়া সত্যিকার দেখা থেকেই আসে শর্তহীন ভালোবাসা— মানুষকে, প্রকৃতিকে, বনের পশুপাখিকে। যত দেখবেন, তত ভালোবাসবেন। আমি তো একটু আগেই থাইল্যান্ডের নং নুচ গ্রামে চারমাসের ব্যাঘ্রশাবককে প্রায় কোলে নিয়ে বোতলের দুধ খাইয়ে এলাম। আমার উরুর ওপর একটা থাবা রেখে, আরেকটা থাবায় আমার বোতল-ধরা হাতটা আঁকড়ে ধরে এক নিশ্বাসে সবটুকু দুধ খেয়ে নিল।

মন আনন্দে ভরে যায়।

'ভ্রমণ', জুলাই ২০০৭

প্রকৃতি আমাদের পরমায়ু

জগদ্বিখ্যাত স্থপতি কর্বুসিয়ের একটি গৃহস্থাপত্য দেখেছিলাম জেনেভায়, চার বা পাঁচতলা সেই বাড়িটির সঙ্গে আকাশ-বাতাস জ্যোৎস্না-যুঁইফুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ওই বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম কর্বুসিয়ের বোনের আমন্ত্রণে। তাঁর ফ্ল্যাটটি ছিল বিরাট। তার ভেতরেই গাছপালা, গাছে গাছে পাখির বাসা, ঘরের মধ্যে পাখির ওড়াউড়ি। এরকম প্রকৃতিস্পর্শী, মুক্তাঙ্গন বাসগৃহ আমি আগে কোথাও দেখিনি। মনে হয়েছিল মানুষের বাসের জন্য এরকম বহির্মুখ ঘরদরজাই দরকার। কেননা মানুষের বাঁধা ঘরে অবাধ প্রকৃতি যদি না চরে তাহলে জীবন বড় হীন হয়ে যায়।

আমি হোটেলে উঠেছি শুনে গৃহকর্ত্রী খুবই বিস্মিত হয়ে আমার সঙ্গী ও সারথি, ভূ-পর্যটক বিমল দে-কে তখনই হোটেল থেকে আমার সুটকেস নিয়ে চলে আসতে বললেন। আমাকে বললেন, তুমি জেনেভায় যে কদিন থাকবে এখানেই থাকবে।

তারপর ঘরের মধ্যেই বড় গাছতলায় বসল চা-পানের আসর। গাছের ডালে পাখির কিচিরমিচির, দেওয়ালে, মেঝেয় স্তূপাকার বইপত্র। লেখার কাগজ, কম্পিউটার।

পরে এই পৃথিবীর এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর মানবিক মহত্ত্ব দেখতে দেখতে একটা জিনিস বুঝেছি— আমাদের জীবন থেকে যতই প্রকৃতিকে ছেঁটে ফেলছি ততই হয়ে উঠছি আমরা অমানবিক। ততই আমরা ভুলে যাচ্ছি মুক্তহৃদয় এই পৃথিবী মানুষেরই আদর্শ বাসভূমি।

প্রকৃতি আমাদের শিক্ষক, আমাদের শুশ্রূষা। প্রকৃতি আমাদের পরমায়ু। সেই প্রকৃতিকে তছনছ করার পরিণামেই কি আজকের এই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বংশবিস্তার আর বিশ্বধ্বংসী বিষনিশ্বাসের গরম হাওয়া?

'ভ্রমণ', জানুয়ারি ২০০৮

ভ্রমণের দিক-দিগন্ত

স্মৃতি ছাড়া কি জীবন হয়? ভাব ছাড়া মন? স্বপ্নহীন মানুষ হয়? তিনে মিলেই ভ্রমণ।
তার ওপর সামনে পুজোর মাস, কষ্ট-ধোওয়া নীল আকাশ, কে তখন ঘরে থাকতে চায়!

তাই বলে মন উড়ু-উড়ু করলেই কি আর হুট করে বেরিয়ে পড়া যায়? বিশেষ করে বাড়ির সবাই মিলে? বিশাল বিচিত্র বিস্ময়কর এই ভারতের কোথায় কত রূপ, কখন কোন রাগ, না জানলে অল্প সময়ে কল্পভ্রমণ হবে কী করে?

শুধু স্বদেশেরই কত দিক, কত দিগন্ত! বিদেশেও আশ্চর্যের অন্ত নেই। এই দেশ আর বিদেশ নিয়ে 'ভ্রমণ'-এর এবারের পুজোর ভ্রমণ গাইড। বেরবে সামনের মাসেই, তার প্রস্তুতি চলছে বেশ কয়েক মাস ধরে। দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে, দেখে, এদেশ ওদেশ ভ্রমণ করে তৈরি হচ্ছে এই শরতের বিশেষ সফরসূচি। ভারতের মধ্যে যেমন কাছে-দূরের সব গন্তব্যের কথা ও ছবি থাকছে, ভারতের বাইরেও তেমনই থাকছে দূর-অদূর নানা দেশের রূপ রং কথা ও কাহিনী। সেই সঙ্গে 'ভ্রমণ'-এর অন্তরঙ্গ পরামর্শ ও পথনির্দেশ।

আমি নিজেও গত কয়েক মাসে কয়েকটা দেশ ঘুরে এসেছি। চিনে, শ্রীলঙ্কায় দূরদর্শনের জন্য আমাদের ভ্রমণচিত্র তৈরির ফাঁকে ভেবেছি ওই দুই দেশের কোন কোন অঞ্চল ছুঁয়ে তৈরি হতে পারে বাঁধা সময়ে অবাধ ভ্রমণের আনন্দসূচি।

এই জুনে গিয়েছিলাম সুইডেনের গোটেবাগ বা গোটেনবার্গে। আহা সে কী নির্জন, শান্ত, সরল ফুলে-ফুলে রাঙা শহর! যদিও পাঁচদিনের সেই সফরের চারদিনই বাঁধা ছিলাম সম্পাদকদের বিশ্বসম্মেলনে, তবু শহরের পথে একদিনের এলোমেলো পদযাত্রায়, ঝাঁকি দর্শনে গোটেবাগের রূপে-গুণে, ভাবে-বিভাবে আমি মুগ্ধ।

সুইডেনের গোটেবাগ থেকে প্রকৃতির স্বর্গভূমি নরওয়ের ফ্লামে যেতে হয় সেদেশের রাজধানী অসলো হয়ে। ট্রেনে গোটেবাগ থেকে অসলো ছ-ঘণ্টার পথ। সেখান থেকে অপরূপ রেলপথ ধরে মিরডাল হয়ে ফ্লাম।

ফ্লাম যেন এক সৌন্দর্যের চিরপূর্ণিমা। সেখানে অন্তত একটা রাত না জাগলেই নয়।

স্বদেশ-বিদেশের এইসব পথের কথা, রথের কথা, রূপের কথা, রঙের কথা থাকছে এবছরের পুজোর ভ্রমণ গাইড-এ।

'ভ্রমণ', জুলাই ২০০৮

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জীবনে ভ্রমণ আগে ছিল যেন জীবন থেকে পালানো। কর্মময় বাস্তব জীবন থেকে দুদিনের কর্মহীন কল্পজীবনে ঘুরে আসা।

গত কয়েক দশকের ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতায় দেখছি সাধারণের জীবনেও ভ্রমণের এই সাধারণ সংজ্ঞা আর অটুট থাকছে না। ভ্রমণ এখন আর জীবন থেকে সরে থাকা নয়, জীবনের আরও গভীরে অবগাহন করা।

প্রণম্য পর্যটক-পরিব্রাজকদের দেশ-পরিক্রমার মূলেও কিন্তু জীবনকে তার ব্যাপকতায়, বৈচিত্রে, গভীরতায়, গূঢ় তাৎপর্যে দেখা। এখন সাধারণের জীবনেও ক্রমশ তার সঞ্চার দেখে আনন্দ হয়।

আমার প্রথম ভারতদর্শন কিশোর-বয়সে সুন্দরবনের জলজঙ্গল আর সেইসব নদীপাড়ের ছোট ছোট গ্রামগুলিতে। সেই শুরু। তারপর হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়ে ক্রমশ ভারতের নানা রাজ্য।

এভাবেই চলে গিয়েছি এদিক-সেদিক অচেনা দিকে। দেখেছি ভারতের নানা রূপ। ভারতের মধ্যে এক মহাভারত। এমন মুগ্ধ করা মহত্ত্ব, এমন বিস্ময়কর বৈচিত্র, এমন সুগভীর জীবনবোধ, প্রকৃতির এমন স্বর্গরাজ্য— সব মিলিয়ে মনের সে এক আনন্দময় জাগরণ, প্রাণের সে এক দূরস্পর্শী দীক্ষা।

সেই দেশ-পরিক্রমায় যে শান্তি ও শিক্ষা, যে আনন্দ ও আবাহন পেয়েছি, এখন আর তেমন করে তা পাই না। সন্ত্রাস আর স্বার্থপরতা, উগ্রতা আর উষ্ণায়ন এখন সারা পৃথিবীকেই যেন গ্রাস করতে চায়।

অথচ এই বসুন্ধরাই মানুষের স্বর্গ। ভালোবাসাই মানুষের জীবনে আলো-আসা।

এই পৃথিবী, এ জীবন— একে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। বাঁচাতে হবে সবরকম দূষণ থেকে। বাতাসের দূষণ, জলের দূষণ, শব্দদূষণ, হৃদয়দূষণ— সব দূষণের বিরুদ্ধে আমাদের যাত্রা। ভ্রমণপথে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি দূষণ-বিরোধী চেতনা। হনন-বিরোধী হুঁশ!

দেশ-পরিক্রমায় আমরা তো বলতে পারি মানুষ যুদ্ধ চায় না, মানুষ সন্ত্রাস চায় না, মানুষ পরিবেশনাশ চায় না, মানুষ চায় শুধু নিষ্কলুষ প্রকৃতি আর নির্মল হৃদয়।

'ভ্রমণ', নভেম্বর ২০০৮

মহাভারতভ্রমণ

ভ্রমণপরিধি যত বাড়ে মনের পরিধি তত বাড়ে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর ঘুরে এসে সুন্দরবনে সাতদিন থাকুন, কিংবা পুরুলিয়ার পর চলে যান জলদাপাড়া লাটাগুড়ির জঙ্গলে, দেখবেন আমাদের এই চিরচেনা বাংলার কী অপরূপ অচেনা রূপ! নানা ভাব নানা রূপের এ এক আশ্চর্য সংকলন। যত দেখি তত শিখি, যত যাই তত জানি। এভাবেই ভ্রমণে মনের জানলা খোলে, অন্তরে আলোর আনন্দ আসে।

এক পূর্ণিমায় যদি কেদারনাথ দেখেন, আরেক পূর্ণিমায় থাকেন কেরালার খাঁড়িতে, এবছর রাজস্থানের মরুগ্রাম দেখে পরের বছর যদি লাদাখিদের রান্নাঘরে বসে চা খান, এক পক্ষ ঘোরেন অরুণাচলে, আরেক পক্ষে আন্দামানে, একবার বারাণসীতে, আরেকবার বান্ধবগড়ে, একবার জিঞ্জিরায়, তো আরেকবার জিম করবেটে, তাহলেই বিস্ময়কর ভারত আপনার মনে একটু একটু করে ধরা দেবে। বেড়ানোই তখন ভেঙে দেবে আমাদের মনের নানান বেড়া। শুধু অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র নয়, ভারতের হাটে-বাজারে মেলায়-উৎসবে ঘুরে বেড়ালেও আপনার এক শাশ্বত মহাভারত পড়া হয়ে যাবে।

'ভ্রমণ', জানুয়ারি ২০০৯

প্রীতিভ্রমণ

অল্প কিছুদিন আগে, কিছুদিনের জন্য সশরীরে দেশের আনাচে-কানাচে বেড়ানো আমার বন্ধ ছিল, দিন কাটছিল রোগশয্যায়। একদিকে যেমন ওষুধ, ডাক্তার, চিকিৎসার ব্যস্ত আয়োজন, অন্যদিকে তেমনই আমার অখণ্ড অবসর। ফলে ঘুমে-জাগরণে আর তো কিছু করার নেই, মন চলে যায় নানা দিকে। কখনও পথে পথে, কখনও নিজেরই ভিতরপানে।

আমার মহাভাগ্য, হাসপাতালে বিশ্ববিশ্রুত মাদার টেরিজার ঘরের দু-তিনটি ঘর পরেই আমার ঘর, একদিন ভোরবেলা আগে থেকে নার্সকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে আমি গেলাম মাদারকে দেখতে। তাঁর ঘরে যিনি তখন পরীক্ষার জন্য রক্ত নিতে এসেছিলেন, সিরিঞ্জ ফোটাতে যাচ্ছেন, তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে মাদার আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, ভগবানের কাছে আমার দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করলেন। তারপর সিস্টারকে আমার ঘরের নম্বর জিজ্ঞেস করলেন ও তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমাকে যিশুখ্রিস্টের একটি মূর্তি দিলেন। ধাতুর ছোট্ট মূর্তি, ইটালিতে তৈরি।

মাদার টেরিজা, সকলেই জানেন, এমনই একজন মানুষ যিনি দুঃস্থ দুর্গত মুমূর্ষু মানুষের আশ্রয়, সেবা ও স্নেহদাত্রী রূপে সারা পৃথিবীতেই পরিচিত।

তাঁর এই বিশ্বব্যাপী মানবপ্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে সেদিনই অন্য একটি কাজের কথা আমার মনে এল। 'ভ্রমণ'-এর যাঁরা পাঠক তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও প্রীতি জন্মালে কেমন হয়? 'ভ্রমণ' তো পাঠককে দেশ দেখায়, দেশের ইতিহাস-ভূগোল-সংস্কৃতির সত্য ও সৌন্দর্যের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়, তাহলে মানুষকে মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেবে না কেন? ভালোবাসা ছাড়া, কী প্রকৃতি, কী মানুষ, কী সৌন্দর্য, কী স্বপ্ন— কিছুই যে বাঁচবে না!

দেশের এক অঞ্চলের 'ভ্রমণ'-পাঠক আরেক অঞ্চলের 'ভ্রমণ'-পাঠককে সপরিবারে অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানান। দু-পাঁচ-সাত দিনের ছুটিতে আপনার বাড়িতে থেকে আপনার অঞ্চল ও তার আশপাশ বেড়িয়ে যেতে বলুন। বিনিময়ে আপনিও সপরিবারে আতিথ্য নেবেন আপনার অতিথির বাড়িতে। তিনিও আপনাকে দেখিয়ে বেড়াবেন তাঁর এলাকার ঐতিহ্য আর উৎসব।

'ভ্রমণ', নভেম্বর ১৯৯৬

দূর-অদূর

মাথায় ঘন কাশফুলের ধাপচাষ, মুখে ভুবন ভোলানো হাসি, প্রবীণ পুরস্কৃত প্রথিতযশা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদেরই বাড়িতে একদিন ভ্রমণকেন্দ্রিক আড্ডায় বলেছিলেন, যে লোক টালায় থাকে সে টালিগঞ্জে তার কোনও বন্ধুর বাড়িতে কয়েকটা দিন ঝাড়া হাত-পা কাটিয়ে গেলে সেও কিন্তু খুব চমৎকার একটা ভ্রমণ হয়ে যায়। কলকাতার একেক জায়গার বৈশিষ্ট্য একেক রকম, গন্ধ ভাষা অলি-গলি পরিবেশ এতই আলাদা যে এক জায়গার লোকের কাছে আরেক জায়গায় গিয়ে কদিন থাকা একটা নতুন দেশ দেখার মতোই। দিব্যি মন ভরে যায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথাটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল এই জন্য যে সেই আড্ডায় উপস্থিত কবির স্ত্রী লেখিকা গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র আঠেরো বছর বয়সে সাইবেরিয়া থেকে ট্রেনে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তখনকার পিকিং, এখনকার বেইজিংয়ে পৌঁছেছিলেন। সেদিনের ঘরোয়া আড্ডায় অন্য অতিথি 'আজকাল' পত্রিকার প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক প্রতাপকুমার রায় চিন-রাশিয়ায় গিয়েছেন একাধিকবার, পি টি আইয়ের চেয়ারম্যান, কি ভারত সরকারের নিউজপ্রিন্ট পারচেজ কমিটির সদস্য হিসাবে। গোটা বিশ্বভ্রমণেরও তাঁর খুব বেশি আর বাকি নেই, তা সত্ত্বেও সামান্য ফাঁক পেলেই আজও বেরিয়ে পড়েন কৃষ্ণনগর বর্ধমান বাঁকুড়া মেদিনীপুর রায়চকে।

সামান্য 'ভ্রমণ'-সম্পাদককেও সংবাদপত্র-সম্পাদকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বা বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী হিসাবে ইউরোপের নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে, এই তো মাস কয়েক আগেও বাসে করে ঘুরে এলাম স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন বা লিসবোয়া।

সেইসব ভ্রমণ ও তার স্মৃতির পাশে বারুইপুর বারাসত ধপধপি ফুলিয়া শান্তিপুর কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ ডায়মন্ডহারবার ক্যানিং গোসাবা ভ্রমণের কথাও ভুলতে পারি না। গোসাবায় বিদ্যাধরী, নাকি দুর্গাদোয়ানি নদীতে ভরা জ্যোৎস্নায় কবি-অধ্যাপক ও দুঃসাহসিক পর্যটক নবনীতা দেবসেন, তাঁর দুই নাবালিকা কন্যা ও ভ্রাতৃপ্রতিম দীপঙ্করকে আমাদের নৌকোয় তুলে নিয়ে অলৌকিক জলযাত্রা ও যাত্রা শেষে একের পর এক নদীতীরে একহাঁটু কাদায় আছাড় খাওয়া এতদিন পরেও আমার মনে একটি মধুর ভ্রমণস্মৃতি হয়ে আছে। এমনকী ডায়মন্ডহারবার লাইনে ধামুয়ায় স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আদিগন্ত ধানখেত চিরে চলে যাওয়া খালে তালগাছের ডোঙায় যেন এক অচিন দেশের দিকে পাড়ি দেওয়া— সে কি কোনও দিন ভোলা যায়? শুনেছিলাম ওই খাল নাকি ডায়মন্ডহারবারের নদীর আত্মীয়।

আমার জীবনের প্রথম ভ্রমণ আরও রোমাঞ্চকর। নিউ মার্কেট থেকে রুকস্যাক মনে করে যেটা কিনেছিলাম সেটা, এখন বুঝি, ছোটদের স্কুল ব্যাগ। তাতে একসেট জামা-প্যান্ট নিয়ে ট্রেনে বাসে পৌঁছে যাই ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ হয়ে নামখানায়। নামখানায় নদীর ধারে টাল দিয়ে রাখা কুমড়োর পাহাড়ই আমার প্রথম পর্বতদর্শন। সেটা ছিল আমার কাছে সন্ন্যাস আর অভিযানের জগাখিচুড়ি। তখন আমার ১৩ বছর বয়স। নামখানার পাগলকরা নদীর গন্ধমাখা হাওয়া আজও মনে হয় আমার দেহ মন ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

হাওয়ার কথায় মনে পড়ল, একদিন, কোথায় যাচ্ছি জানি না, কিছু ভাবিওনি, হঠাৎ একটা কোনও লোকাল ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম, পথে প্রায় ওপারহীন মাঠ ভেঙে হাওয়ার ঝাপটা এসে এই-বুঝি-দম-বন্ধ-করে-দেয়-ভাব করে আমার শরীর টলিয়ে দিচ্ছিল, একটু পরেই সিগন্যাল না পেয়ে ট্রেনটা থামতেই আমি সেই মাঠে নেমে পড়ি। এক সময় মাঠেই ঘুমিয়েও পড়ি।

ঘুম ভাঙতে দেখি একটা শিমুল গাছের তলায় শুয়ে আছি, সামান্য দূরে একটা ছাগলছানা ঘাস খাচ্ছে, তার সঙ্গী এক বালিকা অপলক চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। এটা হয়তো আমার জীবনের স্মরণীয় ভ্রমণগুলিরই একটি।

তাই মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়তো ঠিকই বলেছেন, ভ্রমণ মানেই দূরযাত্রা নয়। আমার আজকাল খুব মনে হয়, ভ্রমণের আসল কথা মন, আসল কথা মনের নবজন্ম। দূরত্ব নয়, স্নেহ ও শুশ্রূষা দেবার মতো কোনও পরিবেশ, মনকে রাঙিয়ে দেবার মতো, জাগিয়ে দেবার মতো যে কোনও জায়গা মানুষের আন্তরিক গন্তব্য। ঢিমে গতির কয়েক ঘণ্টার সামান্য রেল ভ্রমণের অসামান্য বিবরণ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দুয়ার হতে অদূরে' আমার মতে ভ্রমণের একটি মহাকাব্য।

'ভ্রমণ', ডিসেম্বর ১৯৯৬

বেড়ানোর বাধা বেড়ানোর খরচ

অল্প খরচে দেশভ্রমণের ব্যবস্থা না থাকলে খুব অল্প লোকের পক্ষেই দেশ দেখে বেড়ানো সম্ভব। অধিক ব্যয়ে অধিক আরামের ভ্রমণ দোষের নয়, যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা সেভাবেই বেড়াবেন, কিন্তু অধিকাংশের জন্য দরকার সামান্য খরচে সামান্য আয়োজনে শুধু বেড়ানোর নেশায় বেড়ানোর অঢেল ব্যবস্থা।

ক'দিন আগে, একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি ঢাকায় ছিলাম, রাত বারোটার পরমুহূর্ত থেকে পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত শহিদস্মরণসংগীত— 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' আর রাস্তা ভাসানো জনসমুদ্র— সবই শুধু বাংলা ভাষার জন্য, সবটাই শুধুমাত্র বাঙালির মিছিল, দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে, সেই মহা মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে বুক তোলপাড় করে ওঠে, মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের দলে দলে একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায় না! কম খরচে আর খুব সহজে বেড়ানো সম্ভব হলে এ আর এমন কী অবাস্তব ভাবনা!

বাঙালির জীবন থেকে অনেক কিছুই চলে গেছে, আমরা অনেক কিছুতেই পিছিয়ে পড়েছি, তার ওপর পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের মুখের ভাষা বুকের ভাষা হয় নির্বাসনে, নয়তো অপমানে লাঞ্ছনায় ক্রমবিলুপ্তির পথে। সেইজন্যই একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে যাওয়া উচিত। বাংলা ভাষার মর্যাদা ও মহিমা একবার নিজের চোখে দেখে আসা নিতান্ত দরকার।

চলে আসার সময় ঢাকার অনেকেই আমার কাছে জানতে চাইলেন, দার্জিলিং কালিম্পং সিমলা মানালি ইত্যাদি জায়গায় মোটামুটি ভালো হোটেলের ভাড়া কীরকম। মোটামুটি ভালো হোটেলে দুই শয্যার ঘরের ভাড়া স্থান অনুযায়ী দৈনিক পাঁচ-ছশো থেকে হাজার-দেড় হাজার টাকার মধ্যে শুনে কেউ কেউ ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখলেন।

এদেশে-ওদেশে এমন লোকও আছেন যাঁরা অত কম ভাড়ার হোটেলে থাকার কথা ভাবতেই পারবেন না। এরকম পর্যটকদের জন্য দৈনিক দুই তিন হাজার টাকার হোটেল অনেক আছে। তাছাড়া দৈনিক দেড় দুহাজার টাকার মধ্যে রাজস্থানের হেরিটেজ হোটেল, বিভিন্ন মনোরম জায়গায় রিসর্ট হোটেল, পারোর ওলাথাং বা এই ধরনের কিছু বিশিষ্ট হোটেলে জীবনে একবার একটা কি দুটো দিন থেকে অন্য রকম অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা বা শখ হওয়াও খুব দোষের নয়। এর চেয়েও বেশি দামী ও বিলাসবহুল হোটেল ও রিসর্ট আমাদের দেশেই আছে, আরও হোক, তাতে আমাদের নিরানন্দ নেই, কিন্তু সারা দেশ জুড়ে খুব কম খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা খুব বেশি পরিমাণে থাকলে তবেই আমাদের আনন্দ।

ঢাকা থেকে ফিরে বসন্তোৎসবের কয়েকদিন আগে শান্তিনিকেতনে যেতে হয়েছিল। সেখানে কবি শঙ্খ ঘোষ জানতে চাইলেন ভুটানের হোটেল আর তার খরচের বিষয়ে। ফুন্টশোলিংয়ে আমার ইচ্ছা ড্রুক হোটেলে থাকা, ওটাই ফুন্টশোলিংয়ের সবচেয়ে ভালো হোটেল বলে শুধু নয়, হোটেলের মানের তুলনায় ভাড়াটি বেশ কম বলে। থিম্পুতে পারোতে এই ড্রুক হোটেলের ভাড়াই অনেক বেশি।

শঙ্খ ঘোষ: ফুন্টশোলিংয়ের ড্রুক কত কম?

আমার যতদূর মনে পড়ছে দুজনের ঘর ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা।

শুনে শঙ্খ ঘোষ বললেন, তাহলে আর কম কী হল? এর চেয়ে কম ভাড়ার হোটেলেও দিব্যি থাকা যায়।

যায়ই তো! সেইজন্যই তো 'ভ্রমণ'-এ নানা দামের নানা মানের হোটেলের হদিশ দেওয়া হয়। একশো-দেড়শো থেকে শুরু করে আড়াইশো-তিনশো টাকার মধ্যে। আবার আড়াইশো-তিনশো থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। ছ-সাতশো আটশো বা হাজার টাকার হোটেলের খবরও থাকে। তবে দেড়-দুহাজার টাকার বেশ ভালো হোটেলও যেমন বাদ দেওয়া যায় না তেমনই আবার নামমাত্র খরচে বেড়ানোর জন্য হলিডে হোম ইয়ুথ হস্টেলের খোঁজখবরও থাকে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও পণ্ডিত নাট্যকার ডক্টর শিশিরকুমার দাস বললেন, ফুন্টশোলিংয়ের ড্রুক হোটেলের মতো ভালো হোটেলের ভাড়া আজকালকার দিনে ৮০০ টাকা খুব একটা বেশি তো নয়ই, বরং কিছুটা কমের দিকেই বলা যায়। শান্তিনিকেতনে আমরা ছিলাম রতনকুঠির ভি আই পি গেস্টহাউসে, দুজনের ঘরের ভাড়া শুনলাম ৮০ টাকা। দুপুর বা রাতের

আহার ২৮ টাকা। বিশ্বভারতীর অতিথি ছিলাম বলে আমাদের থাকা-খাওয়া ছিল অমূল্য।

গতবছর জুন মাসে বুদাপেস্টে আমি স্থানীয় একজনের বাড়িতে ছিলাম। গাইডবুক থেকে এরকম দুয়েকটি বাড়ি আগে থেকেই বেছে রেখেছিলাম যেখানে হয় গৃহকর্তা নয়তো তাঁর স্ত্রী ইংরিজি বলতে পারেন, ভাড়াও বেশ সস্তা, ব্রেকফাস্ট সহ দৈনিক ২০-২৫ ডলার।

এয়ারপোর্টের প্রাইভেট হোমস রিজারভেশন কাউন্টারের মহিলা প্রথমেই আমাকে এই বলে দমিয়ে দিলেন যে আমার পছন্দের বাড়িগুলোর কোনওটাই এখন খালি নেই। পরে আরও দু-তিনটি ফোন সেরে নিয়ে জানালেন একটি বাড়ি পাওয়া গেছে, গৃহকর্ত্রী ইংরিজি বলেন, আমার জন্য বাড়ির সামনের রাস্তায় তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। ভাড়া দৈনিক ৫০ ডলার।

আরেকটি কাউন্টার থেকে ১২০০ ফোরেন্ট (৬-৭ ডলার) দিয়ে এয়ারপোর্টের মিনিবাসের টিকিট কেটে বাসে উঠে বুঝলাম আমিই একমাত্র যাত্রী। অর্থাৎ মিনিবাসের ভাড়ায় চলেছি যেন ট্যাক্সিতে! নির্দিষ্ট ঠিকানায় ড্রাইভার আমাকে ও আমার সুটকেস নামিয়ে দিলেন। সামনেই মস্ত লম্বা ষাটোর্ধ্ব এক মহিলা আমার করস্পর্শ করে আমার নিষেধ সত্ত্বেও আমার সুটকেস তুলে নিয়ে আমাকে বোধহয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলের একটা লিফটের দিকে নিয়ে যেতে যেতে লিফট খোলা-বন্ধের পদ্ধতি ও চারতলায় ২৯ নম্বর ফ্ল্যাটে পরপর তিনটি চাবি লাগানো ও খোলার নিয়মকানুন শেখাতে লাগলেন। সব শেষে ফ্ল্যাটে পৌঁছে এক বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি আমার মা, মানে শাশুড়ি, এই ফ্ল্যাটে শুধু উনি আর তুমি থাকবে। বড় বেডরুমটা তোমার। মা তোমাকে রোজ ব্রেকফাস্ট দেবে। মা কিন্তু হাঙ্গেরীয় আর জার্মান ছাড়া আর কোনও ভাষা জানে না'। মেয়ে অর্থাৎ এলিজাবেথ তাঁর ইংরিজি সহ চলে গেলেন, আমি আমার নব্বই বছর বয়সী নির্বাক বালিকাবন্ধুর সবাক চোখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

এই ফেব্রুয়ারির এক সন্ধ্যায়, দুনিয়ার নানান দেশে বারো মাসে তেরো ভ্রমণে অভ্যস্ত বাংলা ভাষার দশভুজ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শোনালেন সম্পূর্ণ বিনা ভাড়ায় পুরো একটি ঘরে তাঁর রাত্রিবাসের অভিনব অভিজ্ঞতা। ঘরটি পার্ক সার্কাস কবরস্থানে দুটি কবরের মাঝের জমিতে, ছাঁচি বেড়ার ঘর। মালিক ঢাকা-কলকাতার কবি বেলাল চৌধুরী, তিনিও সেদিন 'ভ্রমণ'-সম্পাদকের গৃহে সান্ধ্য আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন ঢাকার প্রকাশক-সম্পাদক গাজী সাহাবুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী বীথি ও বাংলাদেশের আরও কয়েকজন সাংবাদিক ও সাহিত্যানুরাগী।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়: সেদিন বাড়ি যাবার উপায় নেই, সকলে মিলে আমাকে অগত্যা বেলালের বাড়িতে শুইয়ে দিয়ে চলে গেল। ছোট্ট ঘর। কিন্তু বিছানায় বেশ উঁচু গদি। সকালে বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখে রোদ পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল, দেখলাম চাদরের তলায় তোশকের বদলে বই। ঘরটাও নিচু, চালাঘর। বেড়ার তলা দিয়ে ঘরের বাইরে অনেক লোকের পা দেখা যাচ্ছে। মেয়েদের গলায়, কিন্তু পুরুষের ভাষায়, তারা মনে হয় আমার উদ্দেশেই গালিগালাজ করছে। ঘর থেকে বেরতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম বাইরে থেকে দরজায় তালা দেওয়া।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এরকম বাউল-ফকিরের মতো থাকতে পেলে একটা মস্ত লাভ— একেবারে শূন্য পকেটে বেরিয়ে পড়া যায়। না হলে বেড়ানোর খরচ যেভাবে বাড়ছে তাতে কজন আর কতদিন বেড়াতে পারবেন বলা কঠিন। অথচ সব দেশেই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বেড়ানো দরকার। ভ্রমণ তো আর নিছক আয়েশ কিংবা বিলাস নয় যে শুধু ধনীরা বেড়াতে পারলেই মানবজাতির ভ্রমণতৃষ্ণা বা বেড়াবার প্রয়োজন মিটে যাবে!

অতদূর যাবার দরকারই বা কী? সারা দেশে ঢুঁড়ে আশ্চর্য সব জায়গার কথা ও ছবি তুলে এনে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয় বাংলা ভাষার যে একমাত্র পত্রিকা, মাসে মাত্র কুড়ি টাকা ব্যয় করে সেই 'ভ্রমণ' পত্রিকা কিনতে পারেন কজন? সামান্য এক লক্ষ বাঙালিও না। অথচ কম দামে, কম পৃষ্ঠায়, ছোট আকারে পকেট 'ভ্রমণ'-এর বিক্রি এক লক্ষ ছুঁতে চলল। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে দুলক্ষেও পৌঁছে যাবে। তার মানে মানুষ বেড়াতে চায় না, এমন নয়, বেড়াতে চায়, খরচে কুলোয় না। সেইজন্যই দরকার অনেক বেশি লোকের জন্য অনেক কম খরচে বেড়ানোর ব্যবস্থা। মানুষের জন্য। দেশের স্বার্থে।

'ভ্রমণ', এপ্রিল ১৯৯৮

ভ্রমণে কিছু দিতেও হয়

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এর যুগলপ্রসাদের কথা মনে আছে? মনে না থাকাটা খুবই আশ্চর্যের এবং দুঃখের, ক্ষতিকরও। 'লোকটা সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই— কি অদ্ভুত লোকটা'! নানা রকম ফুলের বীজ দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনে যেখানে ওসব লতা-ফুল নেই সেখানে পুঁতে দেয়। তার নিজের কথায়:

'লবটুলিয়ায় যত ফুলের বন দেখেন, ফুলের লতা দেখেন, ওসব আমি আজ দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ি জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। ..... যেখানে যে ফুল নেই, সেখানে সেই ফুল, গাছ, লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার শখ। সারা জীবন ওই করে ঘুরেছি।'

কত লোকের কত রকম শখ থাকে, এমন শখ কেন সব লোকের থাকে না! যুগলপ্রসাদের মতো মহৎ-হৃদয় মানুষের পায়ে পায়ে ঘোরবার যোগ্যও আমি নই, তবু ভাবতে ভালো লাগে যে

> পেঁপের বিচি পেলেই আমি ছড়িয়ে দিতাম ভুঁয়ে,
> বীজে ভরা শিমুলতুলো ওড়াতাম এক ফুঁয়ে।
> এদিক-সেদিক পুঁতেছিলাম কতই আমের আঁটি,
> ইচ্ছা দিয়ে বৃক্ষ দিয়ে ভরেছিলাম মাটি।

এ নিছক গল্পকথা বা কাব্যকথা নয়, এ তো একেবারে জীবনের কথা। সকলেই জীবনের নানা কাজের মাঝে অন্তত দুটো একটা ফুল-ফলের বীজ মাঠে-ঘাটে পথের ধারে নদীতীরে আঁস্তাকুড়ে ছড়িয়ে দিতে পারেন। প্রত্যেকেই আমরা যখন যেখানে বেড়াতে যাই সেখানে দুয়েকটা গাছের বীজ পুঁতে আসতে পারি। গাছটি নিজের মনোমতো ও যেখানে পুঁতবেন সেখানকার জল-মাটির উপযুক্ত হলে তো আর কথাই নেই। সারা বছর আমরা কত রকম ফল খাই, কত ফুলের কাছে যাই, সেইসব ফুল-ফলের উৎকৃষ্ট জাতের বীজ সযত্নে তুলে রাখা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তারপর বেড়াতে যাবার সময় শুধু মনে করে সঙ্গে নেওয়া। তারপর পাহাড়ে উপত্যকায় নদীর পাড়ে রাস্তার ধারে বীজগুলো পুঁতে দেওয়া বা কখনও কখনও শুধুই ছড়িয়ে দেওয়া। এই কাজে বাড়ির ছোটদের সঙ্গে নিলে তারাও উৎসাহ পাবে, ছেলেবেলা থেকেই নতুন নতুন জায়গায় নতুন নতুন গাছ লাগানোর অভ্যাস তাদের

সারাজীবনের অঙ্গ হয়ে যাবে।

যেসব জায়গায় বেড়াতে যাই, সেখানেও এক জায়গার ফুল-ফল বৃক্ষ-লতা নিয়ে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া সকলের পক্ষে সব সময় হয়তো সম্ভব নয়, তবু, আমার বিশ্বাস, কেউ কেউ হয়তো সে চেষ্টাও করবেন। তাছাড়া পাহাড়ের দেশ, সমুদ্রের দেশ, অরণ্যের দেশ— অজানা দেশের অচেনা মানুষজনকে সদ্য পরিচয় ও প্রথম প্রীতির স্মারক হিসাবে নিজের দেশের ফুল ফল বৃক্ষ লতার বীজ উপহার দিলে নিজের মনটাই নীল আকাশের মতো নির্মল হয়ে যাবে।

'ভ্রমণ', মে ১৯৯৮

সার্বজনীন সৌন্দর্য

দু হাজার সাল শুরু হতে আর এগারো দিন বাকি, রাত সাড়ে চারটেয় দার্জিলিং থেকে ঘুম হয়ে টাইগার হিলে চলেছি। ঘুম স্টেশন তখন গভীর ঘুমে। আকাশে তারাদের খুব ভিড়, অনেকেই ঝাঁক বেঁধে নেমে এসেছে পাহাড়ের ঢালে, মানুষের ঘরবাড়ি রাস্তাঘাটে জাঁকিয়ে বসে ঝিকমিক করছে।

মারুতি ভ্যান থেকে এইসব দেখতে দেখতে চলেছি, হঠাৎ চোখাচোখি হল কালপুরুষের সঙ্গে। আমাদের চোখের সমতলে, আমাদের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে। এত স্পষ্ট যে মনে হয় যেন টুনি বাল্বের তৈরি কালপুরুষ। শুকতারা দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম কেউ আকাশপ্রদীপ জ্বেলেছে।

টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের সৌন্দর্যের কথা সকলেই জানেন, সেই মহৎ দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন। অনেকে একাধিক বার দেখেছেন। অনেকে আবার শেষ রাতের তীব্র শীত সহ্য করে টাইগার হিলে এসেও শেষ পর্যন্ত শুধুই মেঘলা আকাশ দেখে হতাশ হয়েছেন। বিশেষ করে গ্রীষ্মে বর্ষায়, এমনকী শরতে, যখন নির্মল আকাশের কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। মনে আছে, ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে আমিও একবার এইরকম নিরাশ হয়েছিলাম। আগের দিন বিকেল থেকে টাইগার হিলে এসে বসে ছিলাম, তখন ওখানে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের একটি ট্যুরিস্ট লজ ছিল, সেখানেই আমাদের থাকার চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছিল, ছিল আন্তরিক আতিথেয়তা। সবই ছিল, ছিল না শুধু উষালগ্নের নির্মেঘ আকাশ। ফলে কোথায় বা সেই দিকচক্রবাল ক্রমশ রাঙিয়ে, দর্শকদের একাগ্র দৃষ্টি সেইদিকে আটকে রেখে হঠাৎই নিচের মেঘের মাঝসমুদ্র থেকে টুক করে মাথা বের করা অগ্নিগোলক, আর কোথায় বা সেই কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রথম আলোর অপরূপ প্রলেপ!

টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেক দূরে এভারেস্টও দেখা গেল। তার একটু আগে মাকালু অবশ্য অনেক স্পষ্ট। কাঞ্চনজঙ্ঘার ডাইনে-বাঁয়ে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের অনেককেই বছরের অন্যান্য সময় দেখতেই পাইনি। বিশেষ করে কং, কোকতাং, কুম্ভকর্ণ, উত্তর কাব্রু, দক্ষিণ কাব্রু, তালুং, পান্ডিম, জপুনো, সিম্ভো, সিনিয়লচু শৃঙ্গ এমন স্পষ্ট শীতকাল ছাড়া দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

ফেরার পথে সামতেন চোলিং মনাস্ট্রিতে তিব্বতি মাখন-চা পান করে বেশ আরাম হল। তিব্বতিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে তাঁদের চা তৈরির পদ্ধতিটি দেখতে আমার ভারি ভালো লাগে। ড্রামের মধ্যে জমাট বাঁধা মাখন ফেলে একটি দণ্ড দিয়ে মনে হয় যেন দুরমুশ করছে। গুম্ফা থেকে গেলাম বাতাসিয়া লুপ। টয়ট্রেনের রেলপথ জুড়ে শীতের রঙিন পসরা নিয়ে বসেছে ভোরের বাজার— উলের সোয়েটার, টুপি, মোজা, জুতো, এইসব। পিছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

এবার সারাদিন ধরে শুধুই কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ দেখছি। কখনও ঘর থেকে, কখনও পথ থেকে। শীতকালের দার্জিলিংয়ের এটাই বৈশিষ্ট্য। সারাদিন এমন নির্মেঘ আকাশ বছরের অন্য সময় ভাবাই যায় না।

এরই সুযোগ নিয়ে পরদিন একুশে ডিসেম্বর সান্দাকফু যাবার কথা। ক'দিন আগে ফালুটে বরফ পড়েছে, সান্দাকফু যাবার এমন ভালো সময় আর কী হতে পারে! তখনও জানি না, বিধাতার বাঁকা হাসির চেয়ে প্রকৃতির কৌতুকহাস্য কিছু কম ক্ষুরধার নয়। পরদিন ভোররাতে ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখব বলে ট্যুরিস্ট লজের জানলা খুলে দেখি— কোথায় চাঁদ, কোথায় বা জ্যোৎস্না-ধোওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা! মহাশূন্য ছাড়া সামনে আর কিছুই দেখা যায় না।

সান্দাকফু, সকলেই জানেন, যান-বাহিত যাত্রীদের এক রাত দুদিনের ভ্রমণ বা অভিযান। সকালে রওনা হয়ে বেলাবেলি পৌঁছে রাত্রিবাস করে পরদিন সূর্যোদয় দেখে ফিরে আসা। দার্জিলিং থেকে সান্দাকফু ল্যান্ডরোভারে ঘণ্টা চারেকের রাস্তা, তবে যাবার সময় পথে থামতে থামতে দেখতে দেখতে ছবি তুলতে তুলতে যাওয়াই উচিত, তাতে আরও ঘণ্টা দুয়েক লাগে।

একুশে ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সময় পার হয়ে গেল, সূর্যের মুখ দেখা গেল না, এই অবস্থায় আগামীকাল নির্মেঘ আকাশের নিশ্চয়তা কী? সোসাইটি ট্র্যাভেল এজেন্টের মালিক অবশ্য বারবার ভরসা দিলেন, আকাশ ঠিকই পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং কাল ভোরে সান্দাকফুতে সূর্যোদয় দর্শন হবেই। তা সত্ত্বেও স্বচক্ষে মেঘ-কুয়াশার চিরচেনা দার্জিলিং দেখে শেষ পর্যন্ত সান্দাকফু যাত্রা বাতিল করতে হল। সেদিন সারা দিনটাই আকাশ মেঘে ঢাকা, একশো হাত দূরের গাছপালা অদৃশ্য, অতবড় কাঞ্চনজঙ্ঘা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। বছরের অন্য সময় এটাই দার্জিলিংয়ের স্বাভাবিক দৃশ্য। এর মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ উজ্জ্বল দিন মেলে, সকালে কিছুক্ষণ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা দেয়। শীতকালে এর বিপরীত। এইসময় প্রায় প্রতিদিন সারাদিনই রোদে ভাসা নির্মেঘ আকাশ। সেইজন্যই আমার মতে দার্জিলিং যাবার সেরা সময় ডিসেম্বর-জানুয়ারি। তখন হোটেল সস্তা, গাড়ি ঘোড়া সস্তা, ভিড় কম। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন আর রাজকীয় কাঞ্চনজঙ্ঘা তখন বিনামূল্যের দান হিসেবেই পাওয়া যায়।

এইসব দেখি আর ভাবি, এমন কোনও ব্যবস্থা কি হয় না যাতে আমাদের স্কুলের দরিদ্র ছেলেমেয়েরাও শীতকালে একবার দার্জিলিংয়ের টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখে যেতে পারে! সমাজের এতরকম দূষণের মধ্যে তাদের জীবন কাটে, বড়দের এতরকম ক্ষুদ্রতার সাক্ষী হতে হয়, তা থেকে বেরিয়ে এসে একবার অন্তত সত্যিকার বড়, ধ্যানমগ্ন, ধারণাতীত সৌন্দর্যের সান্নিধ্যে আসা নিতান্ত দরকার। আনন্দের জন্য, আত্মবিকাশের জন্য।

এ কি একেবারেই অসম্ভব? কত সেবাসংস্থা, কত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কত জনকল্যাণমুখী সরকারি উদ্যোগ-আদর্শ আছে, সকলে মিলে হৃদয় দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে সচেষ্ট হলে সত্যিই কি অসম্ভব? ভ্রমণ যেমন সবসময়ই আনন্দের, তেমনই আত্মশিক্ষার অনিবার্য অঙ্গও।

২০০০ সাল শুরু হতে যাচ্ছে, শুরু হবে নতুন শতাব্দ, নতুন সহস্রাব্দ, আমাদের প্রস্তাব— দেশভ্রমণ স্কুল-কলেজে আবশ্যিক হোক!

'ভ্রমণ', জানুয়ারি ২০০০

চিরকালের ভারতবর্ষ

এবছর ১২ জানুয়ারি রামনগর থেকে চলেছি লখনউ, আগেরদিন বিকেলবেলা হরিদ্বার থেকে জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে পৌঁছে জিপে এক চক্কর বনভ্রমণ সেরে পরদিন ভোরে যখন হাতির পিঠে আবার বন্যপ্রাণী দর্শনে বেরিয়েছি, বনে তখন কনকনে শীতের হাওয়া আর স্নিগ্ধ অরণ্যঘ্রাণ, সন্তর্পণে কিছুটা যেতে না যেতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

আমার সামনের হাতিতে জার্মানির ভ্রমণলেখক ফ্রাঙ্ক জর্গ রিখটের শীতে জবুথুবু হয়ে বসেছিলেন, বললেন কাল সারারাত ঠকঠক করে কেঁপেছেন, এদিকে বাঘও দেখা হল না। তবে সদ্য মারা আধ-খাওয়া একটা সম্বর দেখে আমরা তো কোন ছার, স্বয়ং মাহুতরাই খুব অবাক, তার কারণ অর্ধভুক্ত প্রাণীর মাথাসমেত অবশিষ্ট অংশটি বাঘমহাশয় শুকনো ডালপাতা দিয়ে অতি নিপুণভাবে ঢেকে রেখে গেছেন! মাহুতরা বলল, এরকম তারা আগে আর কখনও দেখেনি।

ধিকালা থেকে রামনগর পৌঁছে বেলা বারোটায় একটি আধুনিক অরণ্যাবাসে ব্রেকফাস্ট খাওয়া হল। রামনগর থেকে লখনউ প্রায় সওয়া দুশো কিলোমিটার, মাঝখানে বেরিলিতে মধ্যাহ্নভোজ সারার কথা।

তার অনেক আগে অজানা এক গ্রামের ধারে বাস থামাতে হল, কিছু মেরামতি করতে হবে। ততক্ষণ বাসের মধ্যে বসে থাকার চেয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরে আসাই ভালো। বেলা দুটোতেও দেখলাম জলভরা মেঘে আকাশ কালো হয়ে আছে।

পিচরাস্তা ছেড়ে মেটে পথ ধরে সামান্য এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, সামনেই বাড়ির উঠোনে ছোট ছোট ছটি ছেলে ক্রিকেট খেলছে। কনিষ্ঠটির বয়স মনে হল ছয় কি সাত, জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়তো তেরোয় পা দিয়েছে। মাঝের দুজন মনে হয় যমজ। উঠোনের ওপারে একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে বোধহয় ছয়পুত্রের জননী, রান্নায় ব্যস্ত।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছি, বল বলতে গাঁদাফুল, প্রায়ই নতুন বল দরকার হচ্ছে, ব্যাট মোটে একটাই, ফলে রান নেবার সময় ব্যাটসম্যান বলটা মেরেই ব্যাট ক্রিজে নামিয়ে রেখে দৌড় লাগায়, ওপ্রান্তের ব্যাটসম্যান ক্রিজে পৌঁছে মাটি থেকে ব্যাট তুলে তার খেলা শুরু করে, অথবা দ্বিতীয় রানের সম্ভাবনা থাকলে ব্যাট ফেলে রেখেই আবার দৌড় লাগায়।

হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে ব্যাটসম্যান ব্যাটটি নিয়েই আমার কাছে এসে আমাকে তাদের বাড়িতে ঢুকে বসতে বলল, জানাল এক্ষুনি সে আমার জন্য এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে আসছে।

আমার অনিচ্ছা দেখে তার অকপট প্রশ্ন— তাহলে কী দিয়ে সে মেহ্‌মানের সেবা করবে?

দূরে বড় রাস্তায় বাসটা দেখিয়ে বললাম, মেরামত শেষ হলেই আমাকে দৌড়তে হবে, অতএব খুব চটপট এককাপ আদা-চা পেলে সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

এদের অনায়াস আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে আমার আদা-চায়ের আবদারটি খুব খাঁটিই হয়েছিল, কেননা আমাদের ট্যুরিস্ট কোচে আমার জানলার কাচ পুরো বন্ধ না হওয়ায় বাইরের ঠান্ডা হাওয়ায় আমার গলার দফারফা।

ছেলেটি দূরের বাসের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, কতজন আছে? অর্থাৎ তত কাপ চা বানাবে। ইতিমধ্যে রান্নাঘর থেকে তার মাও বেরিয়ে এসেছে, বিশ-বাইশ জনের চা বানাতে হবে জেনে নিয়ে ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল। ছেলেটিও আবার ক্রিজে।

হঠাৎ বাসের হর্ন শুনে আমি উলটো পথে হাঁটতে শুরু করেছি দেখে ছেলেটি দৌড়ে এল, আমার সঙ্গেই বাসের দিকে দ্রুত পায়ে এগোতে এগোতে বলল, সে ড্রাইভারকে আর দশ-পনেরো মিনিট বাস থামিয়ে রাখার অনুরোধ জানাতে যাচ্ছে, ড্রাইভার সাবকেও তো চা খেতে হবে।

গ্রামটির নাম হংসরামপুর। ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এখন ভাবি, ওরকম আতিথেয়তায় নিমন্ত্রণ আজকাল আর ভারতের শহরে দেখা যায় না। অথচ এই হল চিরকালের ভারতবর্ষ।

এযাত্রায় দুসপ্তাহ ধরে উত্তরপ্রদেশের নানা জায়গায় বেড়াতে বেড়াতে ভারতবর্ষের এরকম নানা মুখ আমার দেখা হল।

লখনউয়ে পৌঁছলাম রাত তিনটেয়। তাজমহল হোটেলে আগের দিনের ডিনার বা পরের দিনের প্রাতরাশ হিসেবে এক প্লেট স্যান্ডউইচ খেয়ে যখন শুতে গেলাম তখনও সূর্য ওঠার ঘণ্টা দুই-আড়াই বাকি।

২০০০ সালের সূচনায়, ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে আমাদের এই উত্তরপ্রদেশে ঝটিকাসফর। দিল্লি থেকে রওনা হয়ে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, ধিকালা, লখনউ, বেনারস, সারনাথ, চুনার, এলাহাবাদ, চিত্রকূট, মাহোবা, ঝাঁসি, ওরছা, দেওগড়, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, সিকান্দ্রা হয়ে দিল্লি। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের সহায়তায় উত্তরপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে এই আন্তর্জাতিক ভ্রমণলেখক সম্মেলন। পৃথিবীর নানা দেশের ভ্রমণলেখকেরা সর্বত্র একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার— প্রত্যেকটি দেশ থেকে একজন করে ভ্রমণলেখক এসেছেন। প্রত্যেকেই তাঁর দেশের পত্র-পত্রিকায় ভ্রমণলেখক, অনেকে আবার সংবাদপত্রের ভ্রমণবিভাগের সম্পাদক বা প্রধান সম্পাদক। ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কর্নাটক— এই পাঁচ রাজ্য থেকে এসেছেন পাঁচ প্রতিনিধি ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'ভ্রমণ'-সম্পাদক। পনেরো দিন ধরে আঠেরোজন লেখকের অবিরাম উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণ।

'ভ্রমণ', ফেব্রুয়ারি ২০০০

আমাজন একদিন আমজনতার বিস্ময় হবে

আমাজনের জঙ্গলে বসে লিখছি। আজ ১৭ জুন। দুদিন আগে রিও ডি জেনেরো থেকে সকালের বিমানে ব্রাজিলিয়া হয়ে বিকেলে মানাউস (Manaus) পৌঁছেছি। সেখান থেকে কিছুটা বাসে, তারপর সামান্য হেঁটে নিগ্রো নদীতে মোটরবোটে চড়ে আমাজনের জল-জঙ্গলের মধ্যে এখানকার আরণ্যক হোটেল 'আরিয়াযু আমাজন টাওয়ার্স'-এ যখন পৌঁছলাম তখন রিও ডি জেনেরোর ঘড়ি অনুযায়ী বিকেল ৫টা, আমাজনের ঘড়িতে বিকেল ৪টে।

পরদিন সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমাজনের আদিম অরণ্যে, এ যেন আদি-অন্তহীন এক গভীর কুহেলিকা। অন্ধকার, ভিজে স্যাঁতসেঁতে, গাছ-গাছালি লতাগুল্মের জট, অসংখ্য ঝুলন্ত ঝুরি, সিঁড়ির মতো শিকড়, কত রকম ফল ফুল বীজ পাতা, কত রকম কীটপতঙ্গ পাখি প্রাণী— দেখতে দেখতে মনে হয় আদিমকালের অবিকল পৃথিবীর সঙ্গে আজ আমার দেখা হয়ে গেল। কেউ যদি এভাবে দু-চার ঘণ্টাও আমাজনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, পদে পদে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের অসংখ্য বিস্ময় আবিষ্কার করে হয়তো মূক হয়ে যাবেন।

মাঝে মাঝে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছে, মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে যায়, বহু জায়গায় গাইড ডালপালা কেটে পথ করে দিলে তবেই এগোতে পারছি।

ডালপালা ছাঁটায় আমার অস্বস্তির কথা শুনে গাইড আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, অরণ্যের এতে কোনও ক্ষতি হয় না।

ঘণ্টাদুয়েক গাইডের সঙ্গে ঘোরার পর আমি একটা মস্ত ব্রাজিল-নাট গাছের নিচে বসে গাইডকে ছুটি দিলাম, বললাম ঘণ্টাখানেক পরে আসতে। গাইডের তাতে প্রবল আপত্তি। শেষপর্যন্ত আমি এখানেই থাকব, কোনও কারণেই অন্য কোথাও চলে যাব না— এই রকম কড়ার করে আমাজনের অরণ্যে একলা হবার সুযোগ পেলাম।

পর্তুগিজ গাইডের নাম সোলেই। হঠাৎ সামনের গাছ থেকে হরীতকীর মতো একটা ফল ছিঁড়ে নিয়ে হাতের মস্ত দা-এর এক কোপে সেটাকে দু-টুকরো করে ভেতর থেকে ছোট্ট তুলতুলে একটা পোকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমাজনের জঙ্গলে পথ হারিয়ে গেলে কেউ আর তার চেনা পৃথিবীতে ফিরতে পারে না, তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই সবচেয়ে সমস্যা। ওই অবস্থায় এই পোকা খেয়েই আমাজনের জঙ্গলে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু করতে হয়।

এর মধ্যে একদিন আকাজাতুবা নামে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম, গ্রামের মানুষজনের ছবি তুলেছি। গিয়েছি প্রায়াগেরাঞ্জি নামে একটা দ্বীপে। কিন্তু নটি দেশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত যাট লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই মহারণ্যের প্রায় ছত্রিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারই যেখানে ব্রাজিলের মধ্যে পড়েছে, সেখানে দুটো একটা গ্রাম, দুয়েকটা দ্বীপ, দু-দশ ঘণ্টার অরণ্য অভিযানে সাধ মেটে না। তাও আবার নিছক এই কথার পিঠে কথা বসিয়ে আমাজনের কীই বা বলা যায়! সঙ্গে ছবি দিতে পারলে খানিকটা তবু আন্দাজ দেওয়া যেত। কিন্তু এখনও আমাজনে ছবি তুলে সেদিনই আমাজন থেকে সরাসরি 'ভ্রমণ'-এর দপ্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি।

শুধু আমাজনের ছবি তুলেই বিখ্যাত হয়েছেন ইতালীয়-ফরাসি আলোকচিত্রী লিওনাইড প্রিন্সিপি। আমাজন নিয়ে বহু দিন ধরে একটা বই লিখেছেন ফ্রান্সিসকো রিত্তা বেরনারদিনো, তাঁর সেই 'আমাজন ইমোশানস' নামের বইয়ে প্রিন্সিপির অসামান্য সব ফটো আছে। আমার আমাজন অভিযানের উপরিপাওনা এই বেরনারদিনোর সঙ্গে আলাপ হওয়া, তাঁর মুখে তাঁর আমাজন অভিজ্ঞতার কথা শোনা। তাঁর পর্তুগিজ ভাষা মুখে মুখে আমাকে ইংরিজি করে শোনান তাঁর মেয়ে এলিয়েনা, আমার ইংরিজি পর্তুগিজে বুঝিয়ে দেন বেরনারদিনোকে।

এলিয়েনার সঙ্গে কথা হল, প্রিন্সিপির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন, আমি 'ভ্রমণ'-এ তাঁর কয়েকটি ফটো ছাপার ব্যাপারেও কথা বলতে চাই। এলিয়েনা বললেন, প্রিন্সিপি এখন এখানেই আছেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলে আপনি আনন্দ পাবেন।

সাত সকালেই খবর পেলাম, প্রিন্সিপি গতকালই আবার জঙ্গলে গেছেন, কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

বেরনারদিনোর বইটির ছবিগুলো প্রিন্সিপির দশ বছরের পরিশ্রমের ফসল। তার পরেও প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে, আজও আমাজনের ছবি তোলার কাজ তাঁর শেষ হয়নি।

আমাজন শুধু পৃথিবীর অতীত নয়, পৃথিবীর ভবিষ্যৎও। মানুষের চিরকালের পরমায়ু। আমাজন বাঁচলে তবেই পৃথিবী বাঁচবে, সেটাই এই জলজঙ্গলের এক আশ্চর্য সৌন্দর্য। আমাজন একদিন আমজনতার বিস্ময় হয়ে উঠবে।

যাঁরা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবনে ইকো-ট্যুরিজমের বড় আয়োজন করার কথা ভাবছেন, তাঁরা কি আমাজনের জল-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন? আমাজন তাঁদের অবশ্যই দেখা দরকার। দেখে যাওয়া দরকার নিগ্রো নদীর ওপর দুবছর ধরে আমাজনের লোকদের দিয়ে তাদেরই গৃহনির্মাণরীতি অনুযায়ী বৃক্ষচূড়ার উচ্চতায় সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি দুশো ঘরের এই আরণ্যক হোটেলটি। এই বিস্ময়কর পর্যটক-আবাসটির স্রষ্টা কে জানেন? 'আমাজন ইমোশানস' বইয়ের লেখক ফ্রান্সিসকো রিত্তা বেরনারদিনো।

এবারের এই আমাজন ভ্রমণে পৃথিবীর নানা দেশের পত্র-পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক পরিচালকরা এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজপেপার্স-এর ডিরেক্টর জেনারেল তিমতি বলডিং, সুইডেনের বোনিয়ের সংবাদপত্রগোষ্ঠীর প্রেসিডেন্ট ব্রাউন, ডাব্লু এ এন-এর নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কানাডার একটি বড় সংবাদপত্রগোষ্ঠীর কর্ণধার পারকিনসন, ভারতের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেখর গুপ্ত, মাতৃভূমির ম্যানেজিং ডিরেক্টর বীরেন্দ্রকুমার ও এরকম আরও কয়েকজনকে পেয়েছিলাম।

ফ্রান্সিসকো রিত্তা বেরনারদিনো তাঁর বইয়ে সমুদ্রতত্ত্ববিদ কুস্তোর একটা কথা সযত্নে উদ্ধৃত করেছেন, তার সারমর্ম হল— পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা একদিন পৃথিবী থেকে মুছে যাবে, ভবিষ্যতের যুদ্ধ হবে যারা প্রকৃতিকে রক্ষা করে আর যারা প্রকৃতি ধ্বংস করে এই দুটি দলের মধ্যে। সকলের নজর পড়বে আমাজনে। বৈজ্ঞানিক শিল্পী লেখক সাংবাদিক ছুটে আসবেন বিশ্বপ্রকৃতির এই স্বর্গরাজ্যে, এই মহারণ্যে কীভাবে কী হচ্ছে তা দেখাই হবে সবচেয়ে বড় তাড়না।

'ভ্রমণ', জুলাই ২০০০

বিশ্বজগৎ দেখা না দেখা

আমাদের এই পৃথিবীকে যখন যতটুকু দেখছি, ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য আর অমৃত রহস্যে। যত দূরে যাই, ততই যেন আমাদের কাছের মানুষের অসহনশীলতা, অক্ষমাশীলতা, হৃদয়হীনতা, আত্মক্ষয়কারী সব রকমের ক্ষুদ্রতা আরও বেশি করে মনে পড়ে, আমি অবাক হয়ে ভাবি কেন আমরা এইসব অমানবিক অন্ধকার থেকে সহৃদয় মানুষের বিশাল পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাব না! ঘৃণা নয়, ভালোবাসার জন্যই তো উষায় গোধূলিতে পৃথিবী এমন রাঙা হয়ে ওঠে। পৃথিবীর পরিবেশ আর হৃদয়ের প্রীতি সযত্নে রক্ষা করতে না পারলে আমরা বাঁচব না। এ দুই সম্পদ সামান্য নষ্ট হলেই মানুষের জন্য কোথাও আর কোনও আনন্দ থাকবে না, সুন্দর থাকবে না, ভবিষ্যৎ বলেও কিছু থাকবে না!

ভাগ্যের কথা, আমি মাঝে মাঝে আশ্চর্য পৃথিবী আর তার আশ্চর্য মানুষজন দেখে বেড়াবার ডাক পাই।

এবার রিও ডি জেনেরোয় দেখা হওয়া মাত্র লিথুয়ানিয়ার বন্ধু 'রেসপুবলিকা' দৈনিকের প্রধান সম্পাদক বিতাস টমকুস আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, মার্চে বার্লিনে এসেছিলে, আমাদের ভিলনিয়াস বার্লিন থেকে বিমানে ঠিক দুঘণ্টার পথ। এত কাছে এসেও এলে না! দেশ ছাড়বার ক'দিন আগে একটা ফোন করলেই তো ভিসার কাগজপত্র পাঠিয়ে দেওয়া যেত।

মার্চে বার্লিনের ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম এক্সচেঞ্জ শেষ করে ঠিক দুদিনের জন্য গিয়েছিলাম মিউনিখে। খবর পেয়েই আন্দ্রে ব্লিৎস সোজা অফিস থেকে আমার হোটেলে এসে শহরের বাইরে তাদের নতুন বাড়িতে নিয়ে গেল ডিনার খাওয়াতে। আন্দ্রে-রেগিনার বিয়ের পর এই বাড়িতেই তাদের নতুন সংসার।

রেগিনা যখন বড় প্লেটে করে প্রধান পদটি টেবিলের মাঝখানে রেখে প্রথম টুকরোটি কেটে আমার প্লেটে দিচ্ছে আন্দ্রে ততক্ষণে মস্ত একটা ম্যাপের বই এনে তার একটা পাতায় জার্মানি আর ফ্রান্সের বর্ডারে ছোট একটা গ্রাম দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিল এই পদটি ওই গ্রামের বহু প্রাচীন ও বিশিষ্ট একটি পদ। পদের নাম, গ্রামের নাম দুইই ভুলে গেছি ভেবে একটু খারাপই লাগে। আন্দ্রে কিন্তু অত রাতে নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমাজন থেকে ফিরে এসে জর্জিয়া ভ্রমণের নিমন্ত্রণ পেলাম। যেতে হবে অক্টোবরে। দীর্ঘ ই-মেল পাঠিয়েছেন আমার জর্জিয়ার বন্ধু মানানা দুমবাদজে, 'দিলিস গাজেতি' অর্থাৎ 'ডেইলি গেজেট'-এর উপপ্রধান সম্পাদক। সঙ্গে প্রধান সম্পাদকেরও চিঠি, তাঁর কাগজে নাকি আমার সংবাদ, সাক্ষাৎকার ও জর্জিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছাপাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এমাসের শেষে প্যারিসের কাছেই WAN ও IFRA-র একটি FORUM-এ আমার নিমন্ত্রণ, সেখানে যেতেই হবে। সেখান থেকে যাব জর্জিয়ায়। সেখানে তাঁরা প্রথমেই আমাকে নিয়ে যাবেন জর্জিয়ান কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী গ্রাম গ্রিগোলেতিতে, সেখান থেকে পশ্চিম জর্জিয়ার একটা দারুণ সুন্দর জায়গা গুরিয়ায়। তারপর পূর্ব জর্জিয়ার গ্রামে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে, বিখ্যাত দ্রাক্ষাকুঞ্জে, সুরা উৎসবে, লোকনৃত্যগীত সম্মিলনে। পরিচয় করাবেন বিভিন্ন কবি লেখক শিল্পী, জর্জিয়ার পর্যটন বিস্তারের প্রধান স্থপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বলতে হবে ভ্রমণসাংবাদিকতা বিষয়ে। আমার বন্ধুর বিশেষ ইচ্ছা, অক্টোবরের শেষে রাজধানী তিবিলিসে 'তিবিলিসোবা' উৎসবেও যেন অবশ্যই যোগ দিই।

পৃথিবী ছেড়ে যেদিনই চলে যাই, পৃথিবীটা যেন দেখে যেতে পারি। কেননা পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া কোনও ঘটনা নয়, আসল কথা, পৃথিবীটা দেখে যাওয়া।

'ভ্রমণ', অক্টোবর ২০০০

যত মন তত ভ্রমণ

ভ্রমণ-অভিজ্ঞতায় দেখেছি পৃথিবীর যেমন সীমা নেই, দেশ দেখার যেমন শেষ নেই, মানুষের মনেরও কোনও তল নেই, তার ডানা মেলার আকাশও যেন মহাকাশের মতো অনন্ত।

ভ্রমণে চাওয়া-পাওয়াও অনেক রকম। পথে নেমে কার কিসের অন্বেষণ তা জানে শুধু তারই মন। শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত উক্তি 'যত মত তত পথ'-এর অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছে হয়— যত মন তত ভ্রমণ। ঠাকুরের বাগভঙ্গি চুরি করেই বলি, 'ভ্রমণ কি একরকম গা?'

সত্যিই, ভ্রমণের কত রূপ, কত রীতি, কত স্তর, কত মাত্রা।

মাসখানেক আগেই ফিরেছি দক্ষিণ নিউজিল্যান্ড থেকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সেই স্বর্গরাজ্য এত দূর থেকেও চোখ বুজলেই দেখতে পাই। কবে একদিন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে হঠাৎই দীঘা যাব বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি, অশোক নামে আমার এক বইপ্রেমী বন্ধুও জুটে গেছে, সিঁড়িতেই দেখা হয়ে গেল তখনকার তরুণদের পাগল করে দেওয়া কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, তাঁর মুখে জুনপুটের নাম শুনে আমরা ট্রেনে সোজা খড়্গপুর, খড়্গপুর থেকে বাসে কাঁথি ও সেখান থেকে রিকশায় জুনপুট চলে গেলাম। জনমানবহীন জুনপুটে যখন পৌঁছলাম তখন বর্ষার সন্ধ্যা। থাকার ব্যবস্থা করে আসিনি শুনে রিকশাওলা পকেট থেকে তার ঘরের চাবি বের করে আমার হাতে দিয়ে আদিগন্ত প্রান্তরের একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দিকে আমার বাড়ি। 'আর তিনটে ট্রিপ দিয়েই আমি বাসায় ফিরব। আপনারা এগোন।'

সে এক দীর্ঘ কাহিনী। শেষ পর্যন্ত থেকেছিলাম সমুদ্রের বুকে জেলেদের সঙ্গে, মাছধরার নৌকোয়। সেও এক গভীর ভালোবাসার বৃত্তান্ত। অন্ধকার রাতে, রাত দেড়টা-দুটো নাগাদ, বহু দূরে এক ঝাঁক জোনাকি মাত্র লক্ষ করে কয়েক বার বৃহদাকার মাছের কঙ্কালে ও একবার নর-করোটিতে হোঁচট খেয়ে সমুদ্রতীরে নোঙর করা সেই নৌকোয় পৌঁছেছিলাম। নৌকোগুলো ভোরবেলা যাবে মাঝসমুদ্রে মাছ ধরতে, তারই প্রস্তুতি চলছে। জোনাকিগুলো আসলে সমুদ্রতরঙ্গে দোদুল্যমান এইসব জেলে-নৌকোর আলো।

আজ এতদিন পরেও সেই আলো, সেই আনন্দ এক তিলও ভুলিনি। আমরা ছিলাম সন্তোষ মাঝির নৌকোয়। সে আমাকে জুনপুটে মাঘ মাসে জেলেদের মেলায় আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বলেছিল তখন সে আমাকে দূর সমুদ্রে জনহীন একটা দ্বীপে নিয়ে যাবে, যেখানে অনেক অচেনা পাখির বাসা।

১৯৮৫তে বালতাল হয়ে একদিনে অমরনাথ যাওয়া-আসার বিপজ্জনক চড়াই-উতরাইয়ে আমাকে দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ার পাঠ শিখিয়েছিল একটি কাশ্মীরি বালক, আনাড়ি ছাত্রটির প্রতি তার সেই সযত্ন সনিষ্ঠ শিক্ষকতার ভাষা ও ভঙ্গি ছোটদের একটি গল্পে আমি টুকে রেখেছি।

একবার বুখারার বাজারে একটা 'চায়খানা'য় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে চা খেয়েছিলাম, বুখারার আশ্চর্য মসজিদ-স্থাপত্য ও আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকে সকালের সেই মুক্তহৃদয় বাজারটি একদানা মুক্তোর মতো আমি কুড়িয়ে নিয়েছি।

এরকম কত যে ভ্রমণ সঞ্চয় করে চলেছি।

তার চেয়েও আনন্দের কথা, গন্তব্যের শেষ নেই, বৈচিত্রের শেষ নেই, পথেরও না আছে সংখ্যা, না আছে সীমা। যত মন তত পথ। যে যার নিজের ধরনে পথে নামাটাই আসল। মানুষের মনই তো ভ্রমণ করে।

'ভ্রমণ', ডিসেম্বর ২০০১

গৃহজীবন থেকে গৃহহীনতায়

আমার বোধিলাভের আগে, আমি যখন নেহাতই এক তমসাবৃত বোধিসত্ত্ব ছিলাম, আমার মনে হল : গৃহজীবন ভিড়াক্রান্ত, ধূলিমলিন; যে জীবন বাইরে প্রবাহিত তা বহুদূর প্রসারিত, উন্মুক্ত। সংসারে থেকে পালিশ করা ঝিনুকের মতো চূড়ান্ত নিখুঁত আর খাঁটি জীবনযাপন করা সহজ নয়। ধরো, আমি চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেললাম, হলুদ বসন পরে নিলাম, আর এগিয়ে চললাম গৃহজীবন থেকে গৃহহীনতায়?

লেখা হয়েছে পালি ভাষায়, আমি পড়েছি ইংরিজি অনুবাদে, সেই অনুবাদেরও অক্ষম এই অনুবাদ। তা সত্ত্বেও এই 'আমি' কে— তা আজ আর কাউকে বলে দিতে হয় না। আড়াই হাজার বছরের যুদ্ধ মহামারী ভূমিকম্প ভাঙাগড়া ধ্বংস ধুলোবালি ছাপিয়ে অমর এই পরিব্রাজকের কণ্ঠস্বর আমরা নিমেষে চিনতে পারি।

ওই একটি প্রাচীন কথার টুকরো— 'ধরো ... এগিয়ে চললাম গৃহজীবন থেকে গৃহহীনতায়?' পড়া মাত্র আমার মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যায়। স্মৃতি আর স্বপ্নের ঝড়।

কোন স্মৃতি? কলেজ-জীবনে একবার হঠাৎই কেশ-গুম্ফ কামিয়ে নতুন গেরুয়া পরে দিনের পর দিন বারুইপুরের বনেজঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগলাম— একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে আমি নতুন নতুন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আশ্চর্য সব জায়গা, আশ্চর্য সব মানুষ, কোথাও কোথাও মানুষের দুঃখে বা শোকে বা সংকটে জড়িয়ে পড়ছি, বহু শ্রমে সংগ্রামে তাদের পরিত্রাণের চেষ্টাও করছি। এরকম একেক দিন একেক জায়গায় পৌঁছাচ্ছি, মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখছি, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তা থেকে মুক্তির উপায় বের করছি। একটানা কলেজ কামাই ও বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও আমার সেই দেশ-দেশান্তর যাত্রার দিবাস্বপ্নময় দিনগুলো আমার মনে এমনই গভীর দাগ কেটেছিল যে অনেক বছর পর সেই স্বপ্নভ্রমণের ঝুলি খুলে একটা রূপকথা লিখতে বসি, সে লেখা অবশ্য ক্রমশ নিজের পথে নিজের মতো বদলে যায়।

এ আমার জীবনের কয়েকটি মধুর স্মৃতির একটি।

আর স্বপ্ন? আজও, মাঝে মাঝেই, ঘুমে অথবা জেগে থেকে, স্পষ্ট দেখি, এগিয়ে চলেছি গৃহজীবন থেকে গৃহহীনতায়!

মানুষের এই স্বপ্নই তো ভ্রমণের মূলমন্ত্র। এখনও আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন, 'ভ্রমণ' পত্রিকার কল্পনা আমার মনে কীভাবে এল? আমার উত্তর, স্বপ্ন হয়ে ছিল মনের মাঝারে। আমার একার স্বপ্ন নয়, নতুন কোনও স্বপ্নও নয়, আড়াই হাজার বছর আগেও এই আকাঙ্ক্ষা উৎকীর্ণ হয়েছে।

সন্ন্যাস নয়, সুদূরের স্বপ্ন আমাকে নিত্য হাতছানি দেয়।

'ভ্রমণ', জানুয়ারি ২০০২

বাঁধা পথের বাধা

আমার ভ্রমণভাগ্যের কথা অনেকে চিঠিতে লেখেন। অনেকে বলেন কোন কোন দেশ আমি দেখেছি তার চেয়ে কোন কোন দেশ দেখিনি বলা সহজ।

ভ্রমণভাগ্যের কথা শতবার সত্যি, দেশ দেখার হিসাবটা ষোল আনাই ভুল।

হয়তো পঁচিশ-তিরিশটা দেশে গিয়েছি, একটা দেশও দেখা হয়েছে কি? দেশের শুধু দ্রষ্টব্যগুলি দেখলেই সে দেশ দেখা হয়ে যায়? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর ঐতিহাসিক স্মৃতি আর কালজয়ী শিল্পপীঠ তো দেখবই, কিন্তু দেশের মানুষের আনন্দ-বেদনার কুলুকুলু নদীস্রোত না ছুঁতে পারলে দেশের প্রচ্ছদই শুধু দেখা হয়, অন্তরের কথা শোনা হয় না।

সব নতুন দেশেই আগন্তুকের আবিষ্কারের অপেক্ষায় লুকোনো থাকে অতীত-বর্তমানের নানান রূপ ও রহস্য।

স্বদেশের কথাই যদি ধরি— কাশ্মীর রাজস্থান ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড কর্নাটক কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল অরুণাচল উত্তরাঞ্চল— গেছি তো এই সব অঞ্চলেই, কিন্তু এর কোনও অঞ্চলই কি আমার দেখা হয়ে গেছে? আমার জীবনের সঙ্গে এইসব দেশ-কালের কোনও সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে কি? সত্যিকার দেখাই তো একটা নতুন সম্বন্ধ!

যেমন ভারতের নানা রাজ্য, তেমনই পৃথিবীর দেশ-দেশান্তর নিয়েও আমার একই দুঃখ। অচিন দেশের হৃদয় ছুঁতে, মনে হয়, শুধু ঘরের বাঁধন ছেঁড়াই সব নয়, বাঁধা পথও ছাড়তে হয়।

'ভ্রমণ', জুন ২০০৩

ভ্রমণের মন

পথে নেমে কার মন কী চায়, গৃহজীবন থেকে ক'দিনের গৃহহীনতার দিকে যাত্রায় কার কিসের অন্বেষণ কে জানে?

এযুগের এক বিখ্যাত ভ্রমণলেখিকা ওয়েলসবাসী জান মরিস (লিঙ্গ পরিবর্তনের আগে ছিলেন জন মরিস) তিরিশটিরও বেশি ভ্রমণবই লিখে সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন তিনি আর ভ্রমণকাহিনী লিখবেন না।

মরিস বলেছেন, দয়া দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায়। সেই জন্যই তাঁর বিশ্বাস সভ্য শহরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে করুণা।

পৃথিবীর যে শহরেই তিনি যান, দয়া বা করুণার প্রকাশ দেখবার আশায় স্থানীয় আদালতে একবার যাবেনই।

নতুন কোনও শহরে এসে সেই শহর আর তার মানুষকে তিনি তাদের হাসি দিয়ে বিচার করেন। শহরে পৌঁছেই সেখানকার কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তার মুখের হাসিটা কেমন হয় তা দেখে মরিস আঁচ করে নেন সেখানকার মানুষের সংস্কৃতির ধরন আর সেই সংস্কৃতির জনক সেই শহরটাই বা কীরকম। জান মরিসকে সমালোচকরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইমপ্রেশানিস্টিক ভ্রমণলেখকদের সঙ্গে এক সারিতে বসিয়েছেন। এই সময়ের বহু প্রশংসিত, বহু অনুকৃত ভ্রমণলেখকদের একজন বলা হয় তাঁকে।

আবার, আলেকজান্ডার ফ্রেটারের "Chasing the Monsoon" একেবারে অন্য রকম ভ্রমণ। পুরো বইটাই ত্রিবান্দ্রম থেকে চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত, যতদূর মনে পড়ছে, বৃষ্টিভরা মেঘের যাত্রা অনুসরণ।

সোয়েনহেডেনের কথা সকলেই জানেন। নানা খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণগাথা "Trans-Himalayas" আজও দুর্গম দিগ্বিজয়যাত্রার বেদগ্রন্থ হয়ে আছে।

"Over the high passes" লিখে বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখিকা ক্রিশ্চিনা নোবেল-এর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা আরেক রকম। হিমাচল প্রদেশের আশ্চর্য প্রকৃতি আর সেখানকার গদ্দিদের জীবন এই পর্যটককে ক্রমশ একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। শেষপর্যন্ত নাগরিক সভ্যতা থেকে বহু দূরে হিমালয়ের মেষপালককে বিয়ে করে তিনি হিমাচলের ঋতু ও প্রকৃতি আর তারই সঙ্গে এক সুরে বাঁধা মেষপালকের জীবনযাত্রার আশ্চর্য পাঁচালির সামিল হলেন। এমন জীবন বদলানো ভ্রমণবাসনা হয়তো অনেকের হয়, এরকম অভিজ্ঞতা হয় ক'জনের? আমরা যাই হিমাচলের সৌন্দর্য দেখতে, দূরবিদেশিনী গিয়েছিলেন মানুষের খোঁজে।

ককেশাস-কৃষ্ণসাগরে বাঁধা জর্জিয়া নামের দেশটিতে ঘুরতে ঘুরতে আমিও উপলব্ধি করেছিলাম, পাহাড় নদী সমুদ্র দেশের সৌন্দর্যছবির ফ্রেমমাত্র, দেখবার আসল ছবি হল মানুষ।

'ভ্রমণ', জানুয়ারি ২০০৪

অবাধ ভ্রমণ

দিকে দিকে এমন পৃথিবী, দেশে দেশে এমন জীবনপ্রবাহ— মানুষের ভ্রমণ যেন কোনওদিন শেষ না হয়।
ভ্রমণ ছাড়া আমাদের জীবন অপূর্ণ, শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সংসার অসার। ভ্রমণই আমাদের জীবন। দেশে-দেশে ভাষায়-ভাষায় ধর্মে-ধর্মে পারস্পরিক ভালবাসার এত বড় সেতু আর কী আছে! সব বিভেদ, সব ব্যবধানকে এক সূত্রে বাঁধতে পারে শুধু অবাধ পথ। যার পথ নেই, ঘরও তার কাছে ক্রমশ হয়ে ওঠে রুদ্ধদ্বার। মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো পথই জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু। কবে একদিন লিখেছিলাম—

অচেনা পথ অচেনা পথিক
এ দুই জেনো বন্ধুর অধিক।

কবে প্রথম ঘর ছেড়েছিলাম, প্রথম ধরেছিলাম অনির্দিষ্ট পথ, আজও ভুলিনি। সে ছিল নিছকই ছেলেবেলার অস্ফুট ছটফটানি। যত বড় হয়েছি, অজানা পথের জন্য সেই ছটফটানিও তত বেড়েছে।

কবে প্রথম গ্রামের সীমান্ত-ছোঁয়া রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে অচেনা পথিককে আমাদের বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করেছি, তার যাওয়া হবে না শুনে চোখে জল এসেছে, তাও ভুলিনি। যত বড় হয়েছি, অচেনা মানুষকে কাছে টানবার সেই ব্যাকুলতাও তত বেড়েছে। কবে চলে গিয়েছিলাম অচেনা বাঁশিওয়ালার সুরের টানে অজানা এক গ্রামের পথে!

এভাবেই অচেনা মানুষের আতিথ্যে ঘুরে এলাম অদেখা দ্বীপ টেনেরিফ। এভাবেই ঘুরে এলাম জর্জিয়া নামের দেশটির প্রায় এক মাথা থেকে আরেক মাথা। ইচ্ছে করে, এই আশ্চর্য পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। ইচ্ছে করে, বিচিত্র সব জনপদের ঘরে ঘরে আতিথ্য নিই। দেখতে ইচ্ছে করে জগৎটাকে। জানতে ইচ্ছে করে মানুষের জীবন।

'ভ্রমণ', এপ্রিল ২০০৪

পথে পথে বেড়ানো

মাঝে মাঝেই মনে হয়, জার্মান মহাকবি গ্যেটে আজ থেকে ঠিক ২১৮ বছর আগে যে-পথে জার্মানির কার্লসবাড থেকে ভোর তিনটেয় বেরিয়ে প্রায় দুবছর ধরে ইটালি ভ্রমণ করেছিলেন, আমিও যদি সেই পথে সেইভাবে বেড়াতে পারতাম! সেই যাত্রাই গ্যেটেকে উজাড় করে দিয়েছিল মনের শান্তি, আনন্দের আস্বাদ আর নবজীবনের অনুশীলন। ভ্রমণ মানুষের জীবনকে কতদূর প্রভাবিত করে গ্যেটের ইটালিভ্রমণ তার একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অনেকের মতো আমিও ভাবি, ৩৭ বছর বয়স্ক, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, বিষাদগ্রস্ত, হতোদ্যম এক প্রশাসক, প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও প্রায় অখ্যাত শিল্পীর কালক্রমে মহাকবি ও জার্মান সংস্কৃতির মধ্যমণি হয়ে ওঠার জন্য তাঁর সেবারের ইটালিভ্রমণ ছিল এক সত্যিকার মহাপাঠশালা।

ইটালিযাত্রার প্রথম আট সপ্তাহের ডায়েরি আর নানা জনকে লেখা ভ্রমণকালীন চিঠিগুলি নিয়ে পরবর্তীকালে গ্যেটে 'ইটালিয়ান জার্নি' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। জীবন, শিল্প, প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও দৈনন্দিন দীক্ষালাভের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এইসব চিঠি ও ডায়েরিতে। এ যেন তাঁর আত্মনির্মিতির এক অকপট আলেখ্য।

এবছর মার্চে আমার জার্মানি, গ্রিস, ইটালিযাত্রার সব যখন পাকা, ২৯ তারিখে রওনা হবার কথা, তার দুদিন আগে জার্মানির প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়-শহর মারবুর্গের ডক্টর অমল মজুমদারের নিমন্ত্রণ পেলাম— মিউনিখ থেকে ট্রেনে গেসেন পৌঁছলে তিনি গেসেন থেকে আমাকে মারবুর্গে নিয়ে যাবেন। সেখানে তাঁর গৃহে একদিনের আতিথ্যের পর নিয়ে যাবেন সোজা ভাইমার রাজ্য, যেখানকার ধুলোয় পাথরে ইতিহাসে গ্যেটের স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে।

আমার তো ভারি আনন্দ। এই সুযোগে কালর্সবাড থেকে রাত তিনটের ট্রেনে গ্যেটের যাত্রাপথ ধরে ক্রমশ মিউনিখে ফিরে সেখান থেকে ইটালির পথে বেরিয়ে পড়ব।

গ্যেটের দেখা সেই ইটালির অনেক কিছুই আজ নেই, অনেক কিছু আজও আছে। তাছাড়া এখনকার রূপান্তরিত ইটালি দেখতে দেখতে গ্যেটের তখনকার দেখাটাও আমার মনশ্চক্ষে দেখা হবে। গ্যেটের বইটা তো সঙ্গে থাকছেই।

২৯ তারিখ রাত ৮টায় কলকাতার এক প্রতিষ্ঠিত ট্র্যাভেল এজেন্সি আমাকে বিমানটিকিট পৌঁছে দিলেন। দেখা গেল টিকিটে রোম ছেড়ে আসার তারিখ ভিসার মেয়াদ শেষ হবার চারদিন পর। সেই টিকিট সংশোধন হয়ে যখন এল তখন বিমান ছেড়ে যাবার আর অল্পই বাকি।

এবার চলেছি আজারবাইজান। গত মাসের ব্যর্থ যাত্রার ঠিক একমাস পর, সেই ২৯ তারিখেই। যাচ্ছি সেদেশের পর্যটন মন্ত্রকের আতিথ্যে 'ভ্রমণ' পত্রিকার জন্য লিখতে আর আলফা টিভিতে সাপ্তাহিক 'ভ্রমণ'-এর জন্য ছবি তৈরি করতে। সেই সুযোগে, গ্যেটের পথ ধরে না হোক, রাত তিনটের কালর্সবাড থেকে না হোক, ডক্টর অমল মজুমদারের সখ্যে-সারথ্যে মারবুর্গ-ভাইমার ঘোরা না হোক, গ্রিস ইটালি যতটা পারি দেখা তো হবে।

এবারও বাধা। দু-তিনজনের প্রোডাকশন টিম তো দূরের কথা, একজনও সহকারি ছাড়া অচেনা দেশের ভ্রমণচিত্র তৈরি করার কথা ভেবেছি শুনে একেবারে শেষ মুহূর্তে ভিসা নামঞ্জুর হয়ে গেল। যাওয়া হল না।

'ভ্রমণ', মে ২০০৪

আন্টার্কটিকা ভ্রমণ

দক্ষিণ আফ্রিকায় জিরাফ-জেব্রাদের রাজ্যে, হস্তি-জলহস্তি, হরিণ-হায়না, অস্ট্রিচ-বেবুনদের দেশে টানা তিনদিন মোট ত্রিশ-বত্রিশ ঘণ্টা ছবি ও চলচ্ছবি তুলে, তার দুদিন পরই পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণের জনপদ আর্জেন্টিনার উশুয়াইয়া থেকে আন্টার্কটিকাগামী জাহাজে উঠেছি। মনে মনে ঠিক করেই এসেছি— দুচোখ ভরে দক্ষিণমেরু-অঞ্চল দেখব আর ওই বিস্ময়কর শ্বেত মহাদেশের যত দিকে, যত দূর যেতে পারব তাই নিয়ে, আমার হাত-ক্যামেরায় যতটা সম্ভব, একটি ভ্রমণচলচ্চিত্র তৈরি করব।

১০ নভেম্বর রাত নটা নাগাদ জাহাজ ছাড়ার পরই উশুয়াইয়ার তীরভূমি ছোট হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল। তখন জল, শুধু জল। বিগল চ্যানেল পার হয়ে আমরা ভয়াবহ ঝঞ্ঝা ও দুলুনির জন্য কুখ্যাত ড্রেক প্যাসেজে পড়লাম। কথা ছিল পরদিন বিকেল ৩টে বা ৪টে বা সাড়ে-চারটেয় এইচও দ্বীপে অথবা শেটল্যান্ডে জাহাজ প্রথম নোঙর করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড হাওয়ায় সেদিন কোথাও নোঙরই করা গেল না। পরদিন ১৩ তারিখ সকালে জাহাজ প্রথম থামল হাফ মুন আইল্যান্ডে। সেখানে

এক ঘণ্টা থেকেই ছোট্ট রবার-বোটে চড়ে আবার জাহাজে ফিরে আসতে হল। বিকেলে আরও একটি দ্বীপে আমরা নামতে পারলাম। দ্বীপটির নাম ডিসেপশন আইল্যান্ড।

আজ ১৪ নভেম্বর। সকালে গেলাম নেকো হারবার দ্বীপে। বিকেলে নামবার কথা ছিল প্যারাডাইস বে আইল্যান্ডে। প্রচণ্ড হাওয়া আর ভয়াবহ সব আইসবার্গের হানাদারিতে প্যারাডাইস বে-তে যাবার পরিকল্পনা বাতিল হল। জাহাজের দুপাশে, সামনে, খালি চোখে ও ক্যামেরার লেন্সে যত দূর দেখা যায়, নিশ্ছিদ্র পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে ওঠা তুষারাবৃত পাহাড়শ্রেণীর এ যেন এক অতিকায় চক্রব্যূহ। জাহাজ কোনদিকে কীভাবে পথ করে এগোবে— সেই এখন সমস্যা।

ঠিক হল, আজ আর নোঙর নয়, আইসবার্গের ধাক্কা বাঁচিয়ে আরও অনেকটা এগিয়ে সরু লামিয়ের চ্যানেল দিয়ে জাহাজ বেরিয়ে যাবে। কয়েক ঘণ্টা এইভাবে খুব ধীর গতিতে এগোবার পর রাত নটা নাগাদ ঘোষণা করা হল— প্রবল হাওয়া ও আইসবার্গের জন্য লামিয়ের চ্যানেল দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও বাতিল। ঠিক হল আরও না এগিয়ে আজ সারা রাত অন্য পথ এগিয়ে কাল সকালে ড্যাঙ্কো দ্বীপে পৌঁছবার চেষ্টা করা হবে।

এখন রাত দশটা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে, সমুদ্রে, সমুদ্রোত্থিত পাহাড়ে, বিশালকায় আইসবার্গে এখনও দিনের আভা।

আজ ১৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার, এখন রাত ৯টা ৫০। আমাদের জাহাজ খুব দুলছে। বিকেলে প্রবল হাওয়ার জন্য মিক্কেলসেন দ্বীপে নামা যায়নি।

আন্টার্কটিকায় হাওয়া, ঢেউ, বরফ সবগুলো একসঙ্গে, বা এর যে কোনও একটা, যে কোনও অভিযানের পূর্বঘোষিত ভ্রমণসূচি যখন তখন তছনছ করে দিতে পারে। তাই এখানে কোনও দ্বীপে নামবার কথা আগের দিন এইভাবে ঘোষণা করা হয়— আগামীকাল আশা করছি অমুক দ্বীপে নামব।

আজ সকালে অবশ্য আমরা রবারের ডোঙায় চড়ে সিয়ের্ভা কোভ-এ ঘুরে বেড়িয়েছি। আইসবার্গের মধ্য দিয়ে সে এক অপূর্ব ভ্রমণ। চলমান জোডিয়াক থেকেই আমি প্রায় আধঘণ্টা ছবি তুলতে পেরেছি।

কয়েকদিন আগে বারবার চেষ্টা করেও এইচও দ্বীপে নামা যায়নি। কাল আবার এইচও দ্বীপে নামার চেষ্টা করা হবে এবং সম্ভবত, পরশু উশুয়াইয়ায় ফেরার পথে আমরা আবার কুখ্যাত ড্রেক প্যাসেজে প্রবেশ করব।

আজ ১৭ নভেম্বর। সকাল থেকে অনেক বার ব্যর্থ চেষ্টার পর এইচও আইল্যান্ডে নামার পরিকল্পনা বাতিল করা হল। একটু আগে কিং জর্জ আইল্যান্ডের কাছে একটা রিসার্চ বেস-এ নেমেছিলাম। ভয়ানক হাওয়া, সেইসঙ্গে তুষারপাত ও বৃষ্টি। ফলে, আধঘণ্টা ঘুরেই রবার বোটে উঠে জাহাজমুখী হলাম। তুষারাবৃত ডাঙায় বা ছুটন্ত ডোঙায় সব মিলিয়ে ৫-৬ মিনিটের বেশি ক্যামেরা বার করাই গেল না।

তুষারভাস্কর্যের এই মহাদেশে, পেঙ্গুইনদের এই আপনদেশে এসে আমার দুচোখ ধন্য। মন পরিপূর্ণ। স্টিল ক্যামেরার ফিল্ম আর ভিডিও ক্যামেরার ক্যাসেটের পর ক্যাসেট এই আশ্চর্য মহাদেশের চিত্রে-চলচ্চিত্রে ভরপুর।

আরও তিনদিন থাকব এই জাহাজে।

আন্টার্কটিকা থেকে ফ্যাক্সে, ই-মেলে পাঠানো

'ভ্রমণ', ডিসেম্বর ২০০৪